USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WINROCK INTERNATIONAL

সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

(সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর সদস্যদের জন্য)

Integrated Training Manual on Climate Change Adaptation & Mitigation and Climate Resilient Natural Resources Management

(For CMOs members)

জানুয়ারী, ২০১৪

বাস্তবায়নে ঃ ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এন্ড লাইভলিহুড্স (ক্রেল), ইউএসএআইডি

এই মডিউলটি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আমেরিকার জনগণের সহায়তায়। ক্রেল প্রকল্প দ্বারা এর সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই ম্যানুয়ালের বিষয়বস্তুর সাথে ইউএসএআইডি বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কোন সম্পর্ক নাই।

সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

প্রকাশক	ঃ	ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর ক্রেল প্রকল্প
সরকারী পার্টনার	ঃ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর এবং ভূমি মন্ত্রণালয়
রচনা ও প্রণয়নে	ঃ	বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যডভান্সড স্ট্যাডিস (বিসিএএস) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ দল
		গোলাম রাব্বানি ট্রেনিং স্পেশিয়ালিস্ট
		ড. সমরেন্দ্র কর্মকার ভালনারেবিলিটি এসেসমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট
		মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম সিনিয়র রিসার্চ অফিসার (ট্রেনিং স্পেশিয়ালিস্ট)
		ইলোরা শারমীন সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
সম্পাদনা ও কারিগরি সহযোগিতায়	ঃ	এম. এ. ওয়াহাব কম্পোনেন্ট ম্যানেজারঃ ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং
		ড. দ্বিজেন মল্লিক ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন স্পেশিয়ালিস্ট
প্রথম প্রকাশনা	ঃ	জানুয়ারী, ২০১৪
কপি রাইট	ঃ	ইউএসএআইডি এর ক্রেল

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ৩৬টি রক্ষিত বন, জলাভূমি এবং পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১২ সাল থেকে ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকায়ন (ক্রেল) প্রকল্প।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন (সিএমসি/আরএমও/এফআরইউজি, পিএফ, ভিসিএফ/ভিসিজি/সিপিজি, এনএস এবং আরইউজি) এর সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণের সহায়তায় সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে তাঁদের সামর্থ্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জ্ঞান, সচেতনতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়কে বিবেচনা করে তৈরী করা হয়েছে ম্যানুয়ালটি। তাঁদের এই সামর্থতা বৃদ্ধি মূলত প্রকল্পের লক্ষ্য সাধনে ও অর্জনে অবদান রাখবে এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাজে অংশগ্রহণে প্রনোদিত করবে।

এ ম্যানুয়ালটি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করে তোলার জন্য তৈরী করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটি সার্বিকভাবে গত এক বছরের বেশীসময়ের ক্রেল প্রকল্পের কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা, ব্যবহার, পরিচালনা, পরীক্ষা-নীরিক্ষার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। কাজেই সেদিক থেকে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটিতে অতীতের অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তু, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, ব্যবহার ইত্যাদিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ম্যানুয়ালটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটিতে কিছু ছবি ও প্রশিক্ষণে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হয়েছে যেখানে খুব সহজ, সাধারণ এবং বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণের বিষয়, উদ্দেশ্য, উপকরণ ও প্রক্রিয়াসমূহ ব্যবহার করা যায় এবং একজন প্রশিক্ষক সহজে বুঝে উঠতে পারেন এবং স্বাচ্ছন্দ্যতার সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারেন। সর্বোপরি এর মাধ্যমে একটি সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এ ম্যানুয়ালে জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন, জেন্ডার, সামাজিক বনায়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবস্থাপনা, প্রকারভেদ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও কৌশলের উপর মোট ৯টি অধিবেশন সংযুক্ত করা হয়েছে। যাতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যগণ তাঁদের দক্ষতা অর্জন করে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে সক্ষম হয় এবং জীবিকায়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে জলবায়ু সহিষ্ণু হতে পারেন।

ম্যানুয়ালে বর্ণিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং উপকরণসমূহ পরামর্শমূলক তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকগণ তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণকে সমৃদ্ধি সাধন করবেন যা প্রশিক্ষণকে উন্নতর এবং শিখনের পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করবে।

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ব্যবহার করে যদি দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির কিয়দংশ উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। মূলতঃ এ ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে বিসিএএস এর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ দল কাজ করেছে এবং এর সমৃদ্ধি সাধনে যাঁরা সহযোগিতা করছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পটভূমি ঃ

ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় জলবায়ু সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকায়ন (Climate-Resilient Ecosystems and Livelihoods-CREL) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের (স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয়) প্রতিষ্ঠান ও সুফলভোগীদের জলবায়ু পরিবর্তনের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের কম্পোনেন্ট - ২ এর অধীনে একটি প্রধান কাজ হচ্ছে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ (Training Needs Assessment - TNA)। যা ক্রেল প্রকল্পের সহযোগিতায় বিসিএএস ইতোমধ্যে TNA প্রতিবেদন সম্পন্ন করেছে। TNA এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা CREL প্রকল্পের সাথে যুক্ত থাকবে তাদের জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, ধারণা ও দক্ষতার সমীক্ষা ও তা'বৃদ্ধির কৌশল চিহ্নিত করা।

TNA প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষম হয়।

এই ম্যানুয়ালে জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক তথ্যসমূহ ও প্রয়োজনীয় ছবি সংযোজন করা হয়েছে, যাতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যবৃন্দ খুব সহজেই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ উপলব্ধি করতে পারেন । ম্যানুয়ালটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যবৃন্দ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা লাভ করে এর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা ও অভিযোজনে দক্ষতা অর্জন করে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন।

এ ম্যানুয়াটির লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সচেতনতা, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়নে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যবৃন্দ মতামত ও পরামর্শ প্রদান করে এলাকার উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অবদান রাখতে পারেন।

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ

ম্যানুয়ালটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বর্তমান জ্ঞানকে আরো বৃদ্ধি করা যাতে তাঁরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে সহায়তা এবং নিজেরা কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে

দুর্যোগ হয় তা থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে পারবেন।

ম্যানুয়ালটিতে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন, প্রশমন ও জলবায়ু সহিষ্ণুতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন, প্রশমন ও জলবায়ু সহিষ্ণুতায় বন, জলাভূমি এবং সহ-ব্যবস্থাপনার ভূমিকা উপস্থাপিত হয়েছে ।

ম্যানুয়ালটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা, গ্রীনহাউস গ্যাস ও বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রভৃতি বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, এতে অন্তর্ভূক্ত আছে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়াবলী। এ ম্যানুয়ালটিতে সামাজিক বনায়ন ও এর উন্নত ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ; জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে জেন্ডার প্রসঙ্গ; প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবস্থাপনার ধারণা; বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (বন ও জলাভূমি) এর প্রকারভেদ; বন ও জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব; এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও কৌশল বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

সময়কাল ঃ

ম্যানুয়ালে অন্তর্ভূক্ত বিষয়বস্তু বা অধিবেশনের সংখ্যার ভিত্তিতে কোর্সের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ কোর্সের জন্য সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে দুই দিন, তবে সহায়ক/প্রশিক্ষক বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে, অংশগ্রহণকারীর ধরন ও গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত এ সময়কাল পরিবর্তন করতে পারেন।

অংশগ্রহণকারী ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল প্রতিবেশ ও জীবিকায়ন (CREL) প্রকল্পের অধীনস্ত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন (Co-management Organizations-CMOs) এর সদস্যবৃন্দ। তবে স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাগণ ও ভিসিএফ সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্যও এই ম্যানুয়াল ব্যবহার করা যাবে।

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ২০-২৫ জনের মধ্যে রাখা যেতে পারে। তবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী সংখ্যা ১-২ জন কম বা বেশি হতে পারে, খুব কম বা বেশি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা যেতে পারে।।

ম্যানুয়াল পরিচিতি ঃ

ম্যানুয়ালে ৯টি বিষয় ভিত্তিকসহ মোট ১১টি অধিবেশন রয়েছে-

আলোচ্য সূচিতে যা রয়েছে

- ম্যানুয়াল ব্যবহারের প্রস্তুতি পরামর্শ
- অধিবেশন পরিকল্পনা ঃ

১. সূচনা পর্ব
২. জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রীনহাউস গ্যাস এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ ও অভিঘাত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
৩. বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে বন ও জলাভূমি এবং সহ-ব্যবস্থাপনার ভূমিকা
৪. জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন (সমাজভিত্তিক)
৫. জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে জেন্ডার প্রসঙ্গ
৬. সামাজিক বনায়ন ও এর উন্নত ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ
৭. প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবস্থাপনার ধারণা এবং মৌলিক (Basics) বিষয়সমূহ
৮. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (বন ও জলাভূমি) এর প্রকারভেদ ও সংক্ষিপ্তসার (Profile)
৯. বন ও জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব
১০. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি (Arrangement)
    - নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ (Policy, strategy and plans)
    - সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Government organizations)
১১. কোর্স মূল্যায়ন, পর্যালোচনা ও সমাপ্তি

ম্যানুয়াল ব্যবহারের প্রস্তুতি পরামর্শ

ম্যানুয়ালটি কাদের জন্য এবং কেন ঃ

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি তৈরী করা হয়েছে বাংলাদেশের রক্ষিত বনভূমি ও জলাভূমির সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির সদস্যদের জন্য, যাতে তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জ্ঞান লাভে উৎসাহিত হয়। ম্যানুয়ালটির উদ্দেশ্য হল জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষক তৈরী করা। মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনায় প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন, উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে ম্যানুয়ালটি সহায়তা করবে। তাছাড়া প্রতিটি অধিবেশনের উদ্দেশ্য, সময়, পদ্ধতি, উপকরণ ও প্রক্রিয়া ম্যানুয়ালটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে সহজেই প্রশিক্ষক অধিবেশন পরিচালনা করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি ঃ

যে কোন কাজে বিশেষতঃ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রশিক্ষক/ সহায়ক অবশ্যই পুরো ম্যানুয়ালটি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে পড়তে পারেন। এতে পুরো কোর্স সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে যা সহায়কের অবশ্যই করা প্রয়োজন ।

প্রশিক্ষকের করণীয় ঃ

১. অধিবেশন শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে নির্ধারিত অধিবেশনের উপর পূর্ণ প্রস্তুতি নেবেন;
২. শুরুর পূর্বেই অধিবেশন পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং সহায়ক সামগ্রী প্রস্তুত করে রাখবেন। সকল উপকরণ যথাযথ এবং সঠিক ক্রমানুসারে ব্যবহার করবেন;
৩. অধিবেশন শুরু করার আগে প্রশিক্ষণার্থীদের কুশল জানতে চাইবেন। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষককে তাদেরই একজন বলে মনে করবেন;
৪. অধিবেশনকে প্রাণবন্ত রাখার চেষ্টা করবেন। সম্ভব হলে বিভিন্ন অধিবেশনের শুরুতে অথবা মাঝে মাঝে আনন্দদায়ক কিছু করানোর ব্যবস্থা করবেন যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা আনন্দ পায়। নিজে যতটুকু সম্ভব হাসিখুশি থাকবেন;
৫. অধিবেশন উপস্থাপনকালে কোন ধারণা দেয়ার সময় প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিত ব্যক্তিদের কেন্দ্র করে এমন কোন উদাহরণ দেবেন না, যাতে তারা ব্যক্তিগতভাবে বিব্রত হন বা মানসিকভাবে কষ্ট পান;
৬. ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়ার প্রবণতা পরিহার করবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর প্রতি সমান মনোযোগ ও দৃষ্টি দিবেন;
৭. প্রশিক্ষণে যাতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় সে দিকে খেয়াল রাখবেন। মনে রাখবেন, সব প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষা গ্রহণের ও অংশগ্রহণের ক্ষমতা সমান নয়। কেউ কেউ বেশ সাবলীলভাবে দলের মধ্যে কথা বলতে পারেন যা অন্য অনেকেই পারেন না;
৮. প্রশিক্ষণার্থীরা খুব সহজে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে কিংবা উত্তর দিতে ভুল করলে মনঃক্ষুন্ন

হবেন না অথবা বিরক্তি প্রকাশ করবেন না বরং এরকম অবস্থায় প্রশিক্ষণার্থীরা যা জানে তাই বলার জন্য উৎসাহ দিন;

৯. আলোচনার সময় আলোচনা যাতে মূল বিষয়কে ছাড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে ঢুকে না পড়ে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ নষ্ট না করে অত্যন্ত কৌশলে মূল আলোচনায় ফিরে আসবেন;

১০. এই সহায়িকায় অধিবেশন উপস্থাপনার জন্য যে পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে, সর্বত্রই যে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে প্রয়োজন হলে প্রশিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া পরিবর্তন করে প্রশিক্ষণটি প্রাণবন্ত করতে হবে।

প্রশিক্ষণ অধিবেশনের সময়সূচি ঃ

পুরো প্রশিক্ষণের প্রস্তাবিত ব্যাপ্তি হলো ০২ দিন যা বিষয়বস্তু ও অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনের আলোকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। প্রতি অধিবেশনের জন্য সময় ৬০ মিনিট রাখা হয়েছে। যেহেতু প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া হচ্ছে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও অংশগ্রহণমূলক, সেজন্য বিভিন্ন আলোচনা, অনুশীলন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা সুনির্দিষ্টভাবে মেনে চলা সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে সময় ১০-১৫ মিনিট কম বা বেশী লাগতে পারে। তবে কোর্সের কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অধিবেশন পরিচালনা করার প্রয়োজন হতে পারে।

প্রশিক্ষণের স্থান ঃ

- ভেন্যুর পরিসর যেন এমন হয় যাতে অংশগ্রহণকারীরা ইউ (U) আকৃতিতে বা অর্ধচন্দ্রাকার একটি সারি করে বসতে পারে। আবার ছোট দলেও বসা যেতে পারে যা তুলনামূলকভাবে বেশি কর্যকর।
- ভিপবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড রাখার জন্য জায়গা থাকতে হবে। দলীয় কাজের জন্য জায়গা রাখা যেতে পারে।
- মাল্টিমিডিয়া/প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু প্রদর্শন করার সুবিধার জন্য পর্দা/দেয়াল সাদা হলে ভাল হবে।

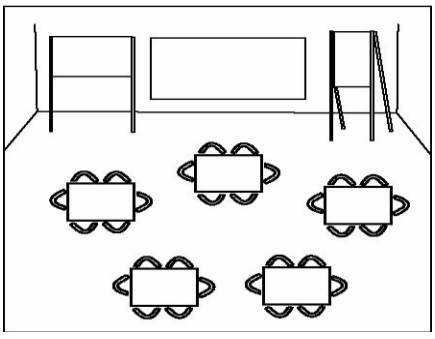

ভেন্যুর পরিসর অনুযায়ী বসার ব্যবস্থা পরিবর্তন করা যেতে পারে।

প্রস্তুতি সভার বিবেচনাসমূহ ঃ

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একটি যোগ্য প্রশিক্ষক দল গঠন করা যেতে পারে এবং এই কাজে একজনকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তাঁদের প্রথম কাজ হতে পারে একটি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা, যেখানে পুরো কোর্সের যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। প্রস্তুতি পর্বের কাজ কোর্স শুরুর ২/৩ দিন আগে করতে পারলে তা সবার জন্য ভাল হতে পারে। এ সভায় কোর্সের উদ্দেশ্য, আদর্শ, প্রক্রিয়া/পদ্ধতি ও পরিচালনা বিষয়ে একমত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে। সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো হতে পারে- অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন, নিবন্ধন, উপকরণ তৈরি ও সূচনা/সমাপনী পর্ব পরিচালনা সংক্রান্ত।

অধিবেশন পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

সকল প্রশিক্ষণার্থীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ ও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হতে হবে। বিভিন্ন উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যাতে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণকে সফল করতে পারেন।

অংশগ্রহণকারী নির্বাচন ঃ

প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী বা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চাহিদার ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা যেতে পারে। অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের পর তাঁদের আমন্ত্রণ পত্র দেয়া যেখানে প্রশিক্ষণের স্থান, সময়কাল ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকতে পারে।

অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন/রেজিস্ট্রেশন ঃ

- ❖ প্রশিক্ষণের সূচনা দিনের প্রথমাংশের মধ্যেই অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধনের কাজটি করে নেয়া যেতে পারে।
- ❖ নিবন্ধনের সময় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজ/কলম ও নামপত্র (Name Tag) দেয়া যেতে পারে।
- ❖ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-১ এর নমুনা ছকটি ব্যবহার করতে পারেন।

অধিবেশনভিত্তিক পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহারের কৌশল/পরামর্শ ঃ

- প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতি, উপকরণ ও সামগ্রী গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি যা বিষয়বস্তুকে দৃশ্যমান করে এবং চিন্তা/শিক্ষনকে প্রসারিত বা সহজ করতে পারে। তাই প্রতি অধিবেশনে যে সমস্ত উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে তার কিছু নমুনা ও পরামর্শ রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে সব ধরণের উপকরণ যেমন-ফ্লিপ-বোর্ড, ভিপ বোর্ড, ফ্লিপ চার্ট, আঁঠাযুক্ত টেপ (মাসকিন টেপ), দলীয় কাজের জন্য তথ্যপত্রের (সংযোজনী তথ্য) ফটোকপি ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখতে পারেন। কিছু ক্ষেত্রে তা পাওয়া না গেলে (বিশেষ করে বোর্ড ভিপকার্ড, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি) সেক্ষেত্রে বিকল্প সামগ্রী ও উপকরণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে;
- পুরো প্রশিক্ষণটি অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের (Participatory) মাধ্যমে পরিচালিত করা;

- যেসব হ্যান্ডআউট আছে তা প্রতিটি দলের/অংশগ্রহণকারীদের জন্য আগে থেকেই ফটোকপি করা;
- ব্যবহারের বোর্ড সব সময় লেখা শেষে মুছে খালি/পরিষ্কার করে রাখতে হবে;
- ফ্লিপ শিট/পোস্টার ঝোলানোর জন্য বোর্ড না থাকলে প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়াল ব্যবহার করা যেতে পারে;
- কার্ড- এর পরিবর্তে রঙিন কাগজ বিভিন্ন আকারে কেটে নেয়া যেতে পারে;
- মার্কারের পরিবর্তে স্কেচপেন ব্যবহার করা যেতে পারে; এবং
- মাল্টিমিডিয়ার পরিবর্তে পোস্টারলিখেও উপস্থাপনা করা যেতে পারে।

সহায়কের জন্য অধিবেশন পরিচালনার কিছু টিপস্ ঃ

অধিবেশন পরিচালনার সময় একজন সহায়ক/প্রশিক্ষকের নিচের বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনঃ

- কোর্স পরিচালনার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা
- সেশন প্ল্যান অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনার প্রস্তুতি নেয়া
- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে কুশল বিনিময় করা
- বসার জন্য স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা এবং সবাই ঠিকমত বসতে পেরেছেন কিনা তা নিশ্চিত করা
- বিষয়বস্তু এবং অংশগ্রহণকারীদের ধরণের সাথে সঙ্গতি রেখে পদ্ধতি নির্বাচন ও তা পরিচালনা করা
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে অধিবেশন পরিচালনা করা
- পূর্বের ও পরবর্তী সেশনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আলোচনা শুরু করা
- সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য সহজ ও সুন্দর ভাষা ব্যবহার করা
- আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও অভিজ্ঞতা শুনা
- অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজন ও আগ্রহের প্রতি সাড়াশীল এবং কৌশলী হওয়া
- দলীয় কাজে সহায়তা করা
- অধিবেশন শেষে আলোচনার সারসংক্ষেপ করা এবং করণীয় নির্ধারণ করা
- নিজের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে পরামর্শ চাওয়া বা দেয়া।

“জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ” প্রশিক্ষণ

(সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর সদস্যদের জন্য)

প্রশিক্ষণ অধিবেশন সূচী

১ম দিন ঃ

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৮ঃ৪৫-০৯ঃ০০	নিবন্ধন	নিবন্ধন ফরম	ফেসিলিটেটর
০৯ঃ০০-০৯ঃ৪৫	অধিবেশন-১ঃ স্বাগত বক্তব্য, উদ্বোধন ও সূচনা এবং প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি ও পরিচিতি। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা যাচাই	আলোচনা, দ্বৈত/একক পরিচয়	সরকারী প্রতিনিধি, ফেসিলিটেটর
০৯ঃ৪৫-১০ঃ৪৫	অধিবেশন-২ঃ জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রীনহাউস গ্যাস এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ ও অভিঘাত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন (পিপিপি)/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১০ঃ৪৫-১১ঃ১৫	**স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান**	**অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ**	**ফেসিলিটেটর**
১১ঃ১৫-১২ঃ১৫	অধিবেশন-৩ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে বন ও জলাভূমি এবং সহ-ব্যবস্থাপনার ভূমিকা	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১২ঃ১৫-১৩ঃ১৫	অধিবেশন-৪ঃ জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন (সমাজভিত্তিক)	আলোচনা, পিপিপি/ ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা, প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১৩ঃ১৫-১৪ঃ১৫	**স্বাস্থ্য বিরতি, নামাজ ও দুপুরের খাবার**	**অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা**	**ফেসিলিটেটর**
১৪ঃ১৫-১৫ঃ১৫	অধিবেশন-৫ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে জেন্ডার প্রসঙ্গ	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর

১৫ঃ১৫-১৫ঃ৩০	**স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান**	**অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ**	**ফেসিলিটেটর**
১৫ঃ৩০-১৬ঃ৩০	অধিবেশন-৬ঃ সামাজিক বনায়ন ও এর উন্নত ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর

২য় দিন ঃ

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৯ঃ০০-০৯ঃ৩০	১ম দিনের পুনরালোচনা	বড় দলীয় আলোচনা	ফেসিলিটেটর
০৯ঃ৩০-১০ঃ৩০	অধিবেশন-৭ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবস্থাপনার ধারণা এবং মৌলিক (Basics) বিষয়সমূহ	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১০ঃ৩০-১১ঃ০০	**স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান**	**অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ**	**ফেসিলিটেটর**
১১ঃ০০-১২ঃ০০	অধিবেশন-৮ঃ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (বন ও জলাভূমি) এর প্রকারভেদ ও সংক্ষিপ্তসার (Profile)	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১২ঃ০০-১৩ঃ০০	অধিবেশন-৯ঃ বন ও জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১৩ঃ০০-১৪ঃ০০	**স্বাস্থ্য বিরতি, নামাজ ও দুপুরের খাবার**	**অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা**	**ফেসিলিটেটর**
১৪ঃ০০-১৫ঃ০০	অধিবেশন-১০ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি (Arrangement) ▪ নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ (Policy, strategy and plans) ▪ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Government organizations)	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১৫ঃ০০-১৫ঃ১৫	**স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান**	**অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ**	**ফেসিলিটেটর**
১৫ঃ১৫-১৫ঃ৪৫	উন্মুক্ত আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১৫ঃ৪৫-১৬ঃ০০	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন	মূল্যায়ন ফরম	ফেসিলিটেটর
১৬ঃ০০-১৬ঃ৩০	প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও সমাপ্তি ঘোষনা	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা	সরকারী প্রতিনিধি, ফেসিলিটেটর

Climate-Resilient Ecosystems and Livelihoods (CREL) Project

Training Program Schedule and Curriculum for Co-management Organizations Members

On

"Climate Change Adaptation and Mitigation and Climate Resilient Natural Resources Management"

Day One:

Time	Training Sessions/Topics	Training Method	Facilitation
08:45-09:00	Registration	Registration form	Facilitators
09:15-09:45	Session-1: Inauguration, Welcome Address and Introductory Remarks and Setting Learning Environment	Discussion, Pair/self introduction	Govt. Representative, Facilitator
09:45-10:45	Session-2: Concepts and basics on Climate Change, Causes of Climate Change, GHG, Global Warming	Discussion, Power Point Presentation (PPP)/Flip Chart, Question and Answer (Q & A)	Facilitator
10:45-11:15	**Health Break and Tea**	**Supply amongst participants**	**Facilitators**
11:15-12:15	Session-3: Climate change in Bangladesh: Roles of Forests and Wetlands and Co-management for Climate Change Adaptation and Mitigation	Discussion, PPP/Flip Chart, Q & A,	Facilitator
12:15-13:15	Session-4: Adaptation to Climate Change (Community Based)	Discussion, PPP/Flip Chart, Small Group Discussion and Presentation, Q & A,	Facilitator
13:15-14:15	**Health Break, Prayer and Lunch**	**Arrange of food for participants**	**Facilitators**
14:15-15:15	Session-5: Gender issue in Climate Change Adaptation and Mitigation	Discussion, PPP/Flip Chart, Q & A,	Facilitator

15:15-15:30	Health Break and Tea	Supply amongst participants	Facilitators
15:30-16:30	Session-6: Social Forestry and Community Participation for better Management	PPP/Flip Chart, Large Group Discussion, Q & A	Facilitator

Day Two:

Time	Training Sessions/Topics	Training Method	Facilitation
09:00-09:30	Recapitulation of Day one Session	Large Group Discussion	Facilitator
09:30-10:30	Session-7: Concepts and basics on Natural Resources and its management	Discussion, PPP/Flip Chart, Q & A	Facilitator
10:30-11:00	**Health Break and Tea**	**Supply amongst participants**	**Facilitators**
11:00-12:00	Session-8: Types & profiles of Natural Resources in Bangladesh: Forests and wetlands	Discussion, PPP/Flip Chart, Large Group Discussion and Q & A	Facilitator
12:00-13:00	Session-9: Importance of the conservation of ecosystems and biodiversity: Forests and Wetlands	Discussion, PPP/Flip Chart, Small Group Discussion and Presentation and Q & A	Facilitator
13:00-14:00	**Health Break, Prayer and Lunch**	**Arrange of food for participants**	**Facilitators**
14:00-15:00	Session-10: Policy and Institutional arrangement for natural resources management ▪ Policy, strategy and plans ▪ Government organizations	Discussion, PPP/Flip Chart, Q & A	Facilitator
15:00-15:15	**Health Break and Tea**	**Supply amongst participants**	**Facilitators**
15:15-15:45	Open Discussion and Question and Answer	Question and answer	Facilitator
15:45-16:00	Training Evaluation	Evaluation format	Facilitator
16:00-16:30	Closing Remarks and feeling sharing	Lecture and Participation	Govt. Representative, Facilitator

সূচীপত্র

দিন	অধিবেশন	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম	অধিবেশন ১	সূচনা পর্ব	১
	অধিবেশন ২	জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রীনহাউস গ্যাস এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ ও অভিঘাত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	১০
	অধিবেশন ৩	বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে বন ও জলাভূমি এবং সহ-ব্যবস্থাপনার ভূমিকা	৬২
	অধিবেশন ৪	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন (সমাজভিত্তিক)	৮৭
	অধিবেশন ৫	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে জেন্ডার প্রসঙ্গ	৯৫
	অধিবেশন ৬	সামাজিক বনায়ন ও এর উন্নত ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ	১০৩
২য়	অধিবেশন ৭	প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবস্থাপনার ধারণা এবং মৌলিক (Basics) বিষয়সমূহ	১১০
	অধিবেশন ৮	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (বন ও জলাভূমি) এর প্রকারভেদ ও সংক্ষিপ্তসার (Profile)	১১৮
	অধিবেশন ৯	বন ও জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব	১৩২
	অধিবেশন ১০	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি (Arrangement) ▪ নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ ▪ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৪৪
	অধিবেশন ১১	কোর্স মূল্যায়ন, পর্যালোচনা এবং সমাপ্তি	১৫৫
		পরিশিষ্ট - ১	১৫৮
		পরিশিষ্ট - ২	১৫৯

অধিবেশন ১

	শিরোনাম ঃ সূচনা পর্ব	

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- কোর্সের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারবেন; এবং
- প্রশিক্ষণের কর্মসূচি, প্রক্রিয়া এবং একসাথে কাজ করার নিয়ম নীতি বুঝতে পারবেন।

সময় ঃ ৪৫ মিনিট

অধিবেশন পরিকল্পনা ঃ

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১.	স্বাগত ও শুভেচ্ছা এবং পটভূমি	বক্তৃতা, আলোচনা	'শুভেচ্ছা' লেখা ভিপকার্ড	১৫ মিনিট
২.	অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি	কার্ড লিখন, অভিজ্ঞতা বিনিময়/ খেলা	পোস্টার পেপার/ ফ্লিপশীট, ভিপকার্ড ও মার্কার	১০ মিনিট
৩.	প্রত্যাশা ও কোর্স পরিচিতি	কার্ড লিখন ও গুচ্ছকরণ অথবা আলোচনার মাধ্যমে হোয়াইট বোর্ড/ফ্লিপ চার্টে লিখন	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপশীট, ভিপকার্ড ও মার্কার	১০ মিনিট
৪.	অন্যান্য	আলোচনা	ফ্লিপশীট ও মার্কার	১০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

সূচনা পর্ব পরিচালনা

১. স্বাগত ও শুভেচ্ছা বক্তব্য, কোর্সের প্রত্যাশা যাচাই, পটভূমি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ
২. পরিচয় পর্ব ও জড়তা ভঙ্গ
৩. প্রশিক্ষণ নিয়ম নীতি প্রণয়ন/প্রদর্শন

৪. প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা যাচাই

কোর্সের পটভূমিতে যা বলা যেতে পারে-

- কোর্স প্রণয়নের পেছনে যদি কোন ঘটনা থাকে
- কোর্সের মেয়াদ, যাদের জন্য উপযোগী
- কোর্স বাস্তবায়নের কৌশল
- কোর্সের কাঙ্খিত উপযোগিতা

অংশগ্রহণকারী পরিচিতি ঃ

- প্রশিক্ষণ কোর্সে যারা এসেছেন তাঁরা একে অপরের সাথে পরিচিত নাও থাকতে পারেন। কিন্তু প্রশিক্ষণ পরিবেশ তৈরিতে অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক পরিচিতি একটি প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সেজন্য তাদের পারস্পরিক পরিচিতি এবং জড়তা ভঙ্গের জন্য পরিচয় পর্ব পরিচালনা করার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিচয় পর্ব পরিচালনা করা যেতে পারে। তবে তা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন-
  - মনের অনুভূতি ছবি এঁকে প্রকাশ করার মাধ্যমে
  - অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে
  - ভিপকার্ড/ ফ্লিপশীটে কিছু লেখার মাধ্যমে
  - দলীয় কোন কাজের মাধ্যমে (প্রকল্পের কার্যাবলী)
  - নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার মাধ্যমে
  - বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে (এইক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর ধরন, সংখ্যা ও সময় বিবেচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)
- পরিচয় পর্বে উপরোক্ত তথ্য/বিষয় ছাড়াও সাধারণত যে তথ্যগুলো জানতে চাওয়া হয়ে থাকে তা হলো- নাম, কর্ম এলাকা, প্রতিষ্ঠানের নাম ও অভিজ্ঞতার বয়স ইত্যাদি।
- পরিচয়ের পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১টি করে নেম ট্যাগ দিতে পারেন যাতে তাঁরা নিজ নিজ নাম লিখে তা দৃশ্যমান করতে পারেন। নেম ট্যাগে প্রশিক্ষণার্থীরা নাম লিখে রাখলে সবার জন্য তা ভাল হয়।

কোর্স পরিচিতি পর্ব পরিচালনার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং যা আগে থেকে লিখে/তৈরি করে রাখা যেতে পারে, তা হলো ঃ

- কোর্সের নাম
- উদ্দেশ্য
- প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া
- কর্মসূচি
- এক সাথে কাজ করার পরামর্শ
- দলনেতার কাজ
- প্রতিবেদকের কাজ
- কার্ড/পোস্টার লেখার নিয়ম
- প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা যাচাই পত্র

- কোর্স মূল্যায়ন ছক

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ঃ

সংযোজনী - ১

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ

উদ্দেশ্যঃ

জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অভিযোজন ও প্রশমন, জলবায়ু পরিবর্তনে জেন্ডার, সামাজিক বনায়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (বন ও জলাভূমি) এর প্রকারভেদ, বন ও জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও কৌশল ইত্যাদি বিষয়ের উপর সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর সদস্যদের প্রায়োগিক জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার বিকাশ।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

দিন-০১

০৮ঃ৪৫ - নিবন্ধন
০৯ঃ০০ - সূচনা পর্ব ও প্রত্যাশা যাচাই
০৯ঃ৪৫ - জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রীনহাউস গ্যাস এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ ও অভিঘাত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
১০ঃ৪৫ - চা বিরতি
১১ঃ১৫ - বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে বন ও জলাভূমি এবং সহ-ব্যবস্থাপনার ভূমিকা
১২ঃ১৫ - জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন (সমাজভিত্তিক)
১৩ঃ১৫ - মধ্যাহ্ন বিরতি
১৪ঃ১৫ - জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে জেন্ডার প্রসঙ্গ
১৫ঃ১৫ - চা-বিরতি
১৫ঃ৩০ - সামাজিক বনায়ন ও এর উন্নত ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ
১৬ঃ৩০ - প্রতিফলন ও দিনের সমাপ্তি

দিন-০২

০৯ঃ০০ - পুনরালোচনা

০৯ঃ৩০ - প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবস্থাপনার ধারণা এবং মৌলিক (Basics) বিষয়সমূহ

১০ঃ৩০ - চা-বিরতি

১১ঃ০০ - বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (বন ও জলাভূমি) এর প্রকারভেদ ও সংক্ষিপ্তসার (Profile)

১২ঃ০০ - বন ও জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

১৩ঃ০০ - মধ্যাহ্ন বিরতি

১৪ঃ০০ - প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি (Arrangement)

- নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ (Policy, strategy and plans)
- সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Government organizations)

১৫ঃ০০ - চা-বিরতি

১৫ঃ১৫ - উন্মুক্ত আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর

১৫ঃ৪৫ - প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

১৬ঃ০০ - প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও সমাপ্তি ঘোষণা

একসাথে কাজ করার পরামর্শ ঃ

- বিশ্বাস করবো, আমরা পরস্পরের সহযোগী/বন্ধু
- আমাদের উদ্দেশ্য এক
- সময় মেনে চলবো, পূর্ণ অংশগ্রহণ করবো
- এক এক করে কথা বলবো, প্রয়োজনে প্রশ্ন করবো
- পরস্পরের কথা শুনবো ও একে ওপরকে সম্মান করবো
- ভিন্নতাকে সমস্যা নয়, সম্ভাবনা হিসেবে কাজে লাগাবো
- প্রক্রিয়ায় আস্থা রাখবো এবং
- মোবাইল ফোন নীরব বা বন্ধ রাখবো।

দল নেতার কাজ ঃ

- সদস্যদের কাছে দলের কাজ ব্যাখ্যা করা
- দলে আলোচনার সূত্রপাত করা
- সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- নির্দিষ্ট সময়ে কাজটি শেষ করা এবং
- দলের পক্ষে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা (প্রয়োজনে)।

প্রতিবেদকের কাজ ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা থেকে নোট নেয়া
- শব্দের পরিবর্তন না করে মূল বক্তব্যগুলো ঠিক করা
- দলের পক্ষে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা
- উপস্থাপনা শেষে আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা এবং
- ফিপ্লা শীটগুলো যথাযথভাবে সহায়কদের বুঝিয়ে দেয়া।

দল ভাগের কৌশল সম্পর্কে ধারণা ঃ

দলীয় কাজ সফলভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষক/সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কাজ বন্টন করতে পারেন। দল গঠনের সময় একটি মাত্র পদ্ধতি ব্যবহার না করে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করলে এক ঘেঁয়েমি থাকে না। কাপড়ের রং, ফুল, ফল, পাখি, জোড় বেজোড় সংখ্যা গণনা এবং লটারীর মাধ্যমেও দল ভাগ করা যেতে পারে।

- কার্ড বা কাগজ কেটে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী সমান ৩/৪/৫/৬ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।
- এক একটি ভাগে ফুল, ফল, পাখি, নদী, মাছ, শহরের নাম আগে থেকে লিখে রাখা যেতে পারে। দল ভাগের সময় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি করে নাম লেখা কার্ড/কাগজ তুলতে বলা এবং ঘুরে ঘুরে অন্যদের সাথে মিলাতে বলা। সব ফুলের নাম লেখা অংশগ্রহণকারীদের একটি দলে, সব ফলের নাম লেখা অংশগ্রহণকারীদের আর একটি দলে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষক/সহায়ক তাঁর পছন্দমত আরও অনেক ভাবে দল ভাগের কৌশল ঠিক করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেও দল ভাগ করা যেতে পারে।

সূচনা পর্বের শেষ পর্যায়ে প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা যাচাই করা যেতে পারে। প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা যাচাই পত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে নিচের নমুনা কপিটির সহায়তা নিতে পারেন

প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা যাচাই (নমুনা)

নাম:

কর্ম এলাকা:

প্রতিষ্ঠানের নাম:

সময় : ১০ মিনিট

নিম্নের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রধানতঃ কে/কি দায়ী ?
দারিদ্র □ **প্রাকৃতিক সম্পদ** □ **প্রকৃতিতে গ্রীনহাউস গ্যাসের আধিক্য** □ **জানি না** □

২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?
জনগণ □ **স্থানীয় প্রশাসন** □ **সরকার** □ **আন্তর্জাতিক উদ্যোগ** □

৩. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সমূহ কি?
সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি □ **নদীর ক্ষীণ প্রবাহ** □ **আকস্মিক বন্যা** □ **সব কয়টি** □

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনের উপায়সমূহ কি?
সচেতনতা বৃদ্ধি করা □ **দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহন** □ **বন্যা সহনশীল নলকূপ স্থাপন** □ **৩টিই** □

৫. নারীদের জলবায়ূ পরিবর্তনের ঝুঁকির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায়সমূহ কি?
শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা □ **জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান** □ **দুর্যোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রকাশের সুযোগ দান** □ **৩টিই** □

৬. প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি?
বন □ **জলাভূমি** □ **২টিই** □ **কোনটিই না** □

৭. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব কোনটি?
প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য □ **প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য** □ **২টিই** □ **কোনটিই না** □

৮. জলবায়ু পরিবর্তনে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়নের উপর প্রভাব কোনটি?
আয়-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া □ **আয়-রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া** □ **২টিই** □ **কোনটিই না** □

৯. জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বনের ভূমিকা কি?

তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে □ **তাপমাত্রা হ্রাস করে** □ **২টিই** □ **কোনটিই না** □

১০. জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে কোনটি?

গাড়ী □ **জলাভূমি** □ **গ্যাস** □ **কোনটিই না** □

অধিবেশন
২

শিরোনাম ঃ জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রীনহাউস গ্যাস এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ ও অভিঘাত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বৈশ্বিক উষ্ণতা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাবেন; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্যোগ বিষয়ে জানতে পারবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১.	আবহাওয়া, জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তন	ঝড়ো ভাবনা, আলোচনা	ফ্লিপশীট, কার্ড ও মার্কার	১০ মিনিট
২.	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ	পঠন ও আলোচনা	তথ্যপত্র, ফ্লিপশীট ও মার্কার	১৫ মিনিট
৩.	গ্রীনহাউস গ্যাস	কার্ড লিখন ও আলোচনা	ভিপকার্ড ও মার্কার	৫ মিনিট
৪.	বৈশ্বিক উষ্ণতা	ঝড়ো ভাবনা, দৃশ্যমান উপস্থাপনা/আলোচনা	পোস্টার/ মাল্টিমিডিয়া ফ্লিপশীট ও মার্কার	৫ মিনিট
৫.	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্যোগ এবং বাংলদেশে প্রধান জলবায়ু দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	তথ্যপত্র, ফ্লিপশীট ও মার্কার	২৫ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

আবহাওয়া, জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তন

- আবহাওয়া ও জলবায়ু কি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ঝোড়ো ভাবনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। নিচের প্রশ্নগুলো করার মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন-
  - আবহাওয়া ও জলবায়ু কি? এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের উত্তরগুলো ফিপ্লা শীটে লিখে রাখতে পারেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ আলোচনায় পঠন ও আলোচনা পদ্ধতির সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিষয় সম্পর্কে তথ্যপত্র সরবরাহ করে বিভিন্ন জনকে অংশবিশেষ পড়তে দেয়া এবং তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তবে, সহায়ক এক্ষেত্রে বিকল্প কৌশলও অনুসন্ধান করতে পারেন।

গ্রীনহাউস গ্যাস

- গ্রীনহাউস গ্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের জোড়া দলে ভাগ করে প্রতিটি দলকে গ্রীনহাউস গ্যাস কেন বাড়ছে এর ১টি পয়েন্ট ১টি কার্ডে লিখতে দেয়া যেতে পারে। লেখা শেষে তাঁদের মতামত নিয়ে আলোচনা করে কার্ডগুলো গুচ্ছ করা যেতে পারে ।

বৈশ্বিক উষ্ণতা

- বৈশ্বিক উষ্ণতা কি? তা নিয়ে আলোচনা করার পর বৈশ্বিক উষ্ণতার ওপর তৈরি পোস্টার বা মাল্টিমিডিয়াতে বিষয়সমূহ দৃশ্যমান করে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- আলোচনা এবং পোস্টার তৈরির ক্ষেত্রে সংযোজনীর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্যোগ এবং বাংলাদেশে প্রধান জলবায়ু দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন

- এ পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্যোগ এবং বাংলাদেশে প্রধান জলবায়ু দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সংযোজনীর সহায়তায় আলোচনা করা যেতে পারে।

- সবশেষে আলোচনার সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে।

আবহাওয়া ও জলবায়ু কি?

আবহাওয়া হলো কোন এলাকার দৈনিক তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা, বায়ু চাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির তাৎক্ষণিক অবস্থা; ভূপৃষ্ঠে কোন এলাকার অবস্থান ও এর সাপেক্ষে সূর্যের অবস্থান এর উপর ভিত্তি করে আবহাওয়া নির্ধারিত হয়।

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। অর্থাৎ আবহাওয়ার মৌলিক উপাদান যথা - বায়ু চাপ, তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় অবস্থা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা (Concept of Climate Change) ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন বলতে সাধারণত আমরা একটি গড় জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে বুঝে থাকি। জাতিসংঘের আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) এর তৃতীয় মূল্যায়ন রিপোর্টের অনুসারে, "একটি গড় জলবায়ুর স্থিতিবস্থা বা গড় পরিবর্তনশীলতায় যখন পরিসংখ্যানগত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়, যা দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত থাকে (সাধারণত একযুগ বা তার বেশি সময় ব্যাপী) তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে।"

কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে একটি এলাকার আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা যা ধীরে ধীরে ঘটে কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব অস্তিত্বসহ এ গ্রহের জীববৈচিত্র্য ব্যাপক হুমকির সম্মুখীন।

একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা তথা জলবায়ু পরিবর্তন। গ্রীনহাউস গ্যাস ও কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রভাবে ওজোন স্তরের তারতম্য, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বৈশ্বিক উষ্ণতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানাবিধ বিপর্যয়ের মুখোমুখি আজকের সভ্যতাগর্বী মানবসমাজ। কালের পরিক্রমায় উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে গিয়ে আধুনিক মানুষ পরিবেশের ওপর চালিয়েছে নির্মম অত্যাচার, আর যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করেছে প্রাকৃতিক সম্পদ। শিল্প বিপ্লবোত্তর মানুষের প্রযুক্তিজ্ঞান, ভোগবাদী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নিজের প্রভূত্ব কায়েমের চেষ্টাকে দিয়েছে পরিবেশের উপর সামঞ্জস্যবিহীন উন্নয়নের চিহ্ন । কিন্তু পরিবেশ ও প্রতিবেশের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে কখনো মানব জাতির ভাববার সুযোগ হয়নি ।

ফলশ্রুতিতে বিপর্যস্ত ধরণী, উষ্ণ পৃথিবী, নিঃস্ব পরিবেশ, লুণ্ঠিত মানবতা আর্তনাদ করছে- "পৃথিবী একটাই, একে বসবাসযোগ্য করো"। এমতাবস্থায় জলাবায়ু পরিবর্তনের এ বিপজ্জনক অবস্থা হতে ধরণীকে বিপদমুক্ত ও বসবাসযোগ্য করা আমাদেরই দায়িত্ব।

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বে একটি মারাত্মক সমস্যা। পৃথিবীর বহু দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের দিক দিয়ে সবচেয়ে বিপদাপন্ন (Vulnerable) দেশ। বস্তুতঃ বিশ্ব আজ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ ঃ

১. মনুষ্য সৃষ্ট কারণ ঃ

পৃথিবীতে মানুষের বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের ফলে বিশেষকরে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, শিল্পকারখানা ও মোটরযান চালনা এবং বনাঞ্চল ধ্বংস ও উজাড়ের ফলে ক্রমান্বয়ে জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনে মনুষ্য সৃষ্ট কারণসমূহ হলো-

ক) বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ঃ

শিল্প, কল-কারখানা বৃদ্ধির কারণে বাড়তি স্থান সংকুলানের জন্য কৃষিভূমি বা বনভূমির উপর চাপ বাড়ছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০ হেক্টর কৃষি বা বনভূমি চলে যাচ্ছে বাসস্থান, শিল্পকারখানা ও রাস্তাঘাট তৈরীতে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য। এভাবে বৃক্ষ ধ্বংস হওয়ায় পরোক্ষভাবে বায়ুমন্ডলে কার্বন ও গ্রীণ হাউজ গ্যাস বেড়ে যাচ্ছে।

বনাঞ্চল ধ্বংস

খ) জলাভূমির অবক্ষয় ঃ

নদীর ভাঙ্গন ও শুকিয়ে যাওয়া, জলাভূমির দূষণ ও অপরিকল্পিত ভাবে ব্যবহারের ফলে কমে গেছে জলাভূমি ও বিপন্ন হচ্ছে জলপ্রতিবেশ যার ফলস্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে জলবায়ুতে পরিবর্তন আসছে।
এছাড়াও মনুষ্য সৃষ্ট কারণগুলির মধ্যে আছে-

- শিল্পায়ন ও খনিজ জ্বালানী পোড়ানো
- পাহাড় কাটা
- নদীপথের স্বাভাবিক গতিরোধ
- অবকাঠামো নির্মাণ
- মাত্রাতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ
- বনজ সম্পদ ধবংস।

পাহাড় কাটা

নদীপথের স্বাভাবিক গতিরোধ

মাত্রাতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ

বনজ সম্পদ ধবংস

গ) বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming) ঃ

বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব

পৃথিবীর ভূ-ভাগের নিকট স্তরের বায়ুর ও মহাসাগরে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে। যা মধ্য বিংশ শতাব্দী হতে শুরু হয়েছে এবং এ বৃদ্ধি চলতে থাকবে। বিংশ শতাব্দীর শুরু ও মধ্যে বিশ্বের উপরিভাগের তাপমাত্রা ০.৯৮°C ± ০.১৮°C (১.৩৩°+০.৩২°F) বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্বন নিঃসরণই বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য ৮৪.৮১% দায়ী। জাতিসংঘের আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল (IPCC) এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মানুষের কর্মকান্ড যেমন জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ানোর ফলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মত গ্রীনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ এবং বন ধ্বংসের কারণে বিংশ শতাব্দির মধ্যভাগের তুলনায় বর্তমানে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইপিসিসি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, সৌর বিকিরণ (Solar Radiation) বা অগ্ন্যুৎপাত বিশ্ব উষ্ণায়নে খুব কমই প্রভাব রেখেছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নঃ

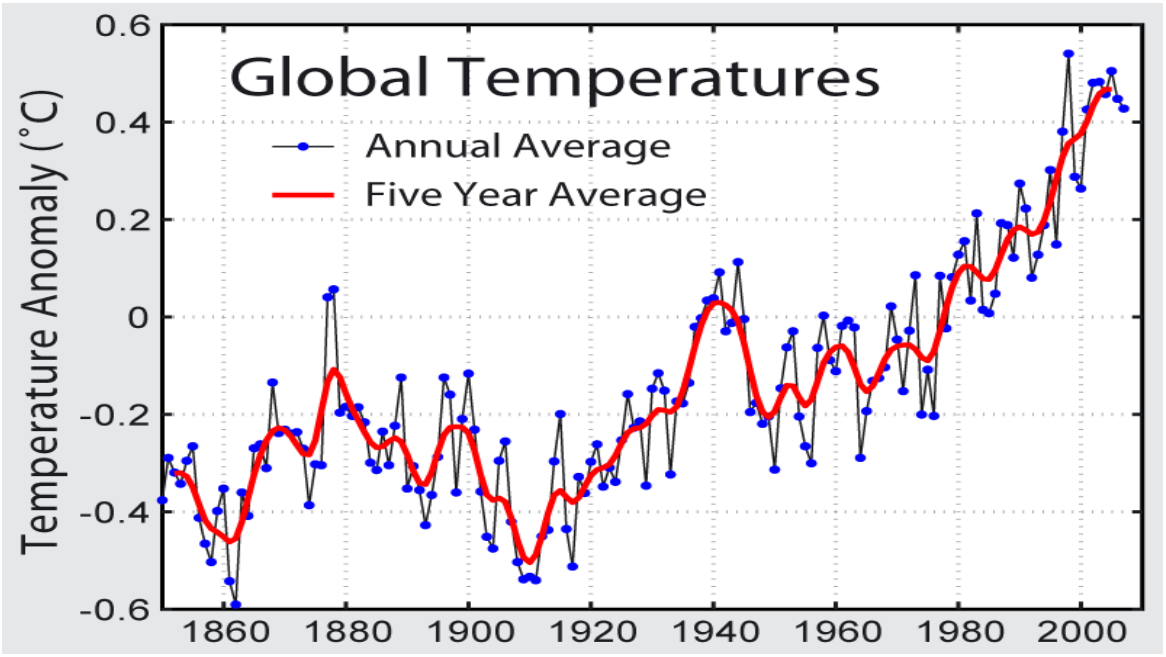

সাল	গড় বার্ষিক তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে.)
১৮৬০	-০.৬		০.৯৮ ± ০.১৮
১৮৮০	-০.১৯	+০.৪১	
১৯০০	-০.১৫	+০.০৪	
১৯২০	-০.২৩	+-০.০৮	
১৯৪০	+০.১০	+০.৩৩	
১৯৬০	-০.১০	-০.২	
১৯৮০	+০.১৯	+০.২৯	
২০০০	+০.৪২	+০.২৩	

বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তুষার বা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধরনে পরিবর্তন এসেছে এবং প্রায় গ্রীষ্মমন্ডলীয় (Sub-tropical) অঞ্চলের মরুকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া মেরু অঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সেখানে জমে থাকা বরফ (Glacier, Permafrost, Sea-ice) গলতে শুরু করেছে। অন্যান্য পরিবর্তনগুলির মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন, কিছু কিছু জীবের বিলুপ্তি এবং কৃষি উৎপাদনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

এ বিশ্ব উষ্ণায়নকে মোকাবেলা করতে হলে গ্রীণহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে হবে, অভিযোজন (Adaptation) দ্বারা উষ্ণতার ফলে ক্ষতির প্রভাব কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে বা ভূ-প্রকৌশল (Geo-engineering) দ্বারা বিশ্ব উষ্ণায়নের গতি-প্রকৃতি কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকাংশ দেশ বিশ্ব উষ্ণায়ন মোকাবেলায় Kyoto Protocol-এ স্বাক্ষর করেছে এবং Copenhagen সম্মেলনে এ ব্যপারে বিশ্বের জাতিগুলির ঐক্যমত হয়েছিল।

ঘ) ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ঃ

পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৬০০ কোটির উপর এবং প্রতি বছর ৯ কোটি করে জনসংখ্যা বাড়ছে। এ বিপুল জনগোষ্ঠির স্থান সংকুলান ও চাহিদা পূরণে বন ও বনভূমি এবং কৃষি ভূমির উপর চাপ বাড়ছে। ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনে সৌর শক্তি শোষণ/প্রতিফলনে পরিবর্তন আনে এবং তা জলবায়ু পরিবর্তনে সহায়তা করে।

ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন

ঙ) গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ঃ

বিভিন্ন গ্যাসের একটি বলয় পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে যা জীবকূলের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রাকে সংরক্ষণ করে থাকে, এ গ্যাসের বলয়কে বায়ুমন্ডল বলে। মানুষের বিভিন্ন অপরিণামদর্শী কার্যক্রমের কারণে এই গ্যাসীয় বলয়ে এখন পরিবর্তন এসেছে। বায়ু মন্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা অবলোহিত (Infrared) রশ্মি শোষণ ও বিকিরণের ফলে পৃথিবীর বায়ু মন্ডলের নিচু স্তরে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের উষ্ণতার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বায়ু মন্ডলের গ্রীনহাউস প্রভাব বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, বায়ুমন্ডল যদি না থাকতো তবে পৃথিবী চিরকাল ঠান্ডা থাকতো।

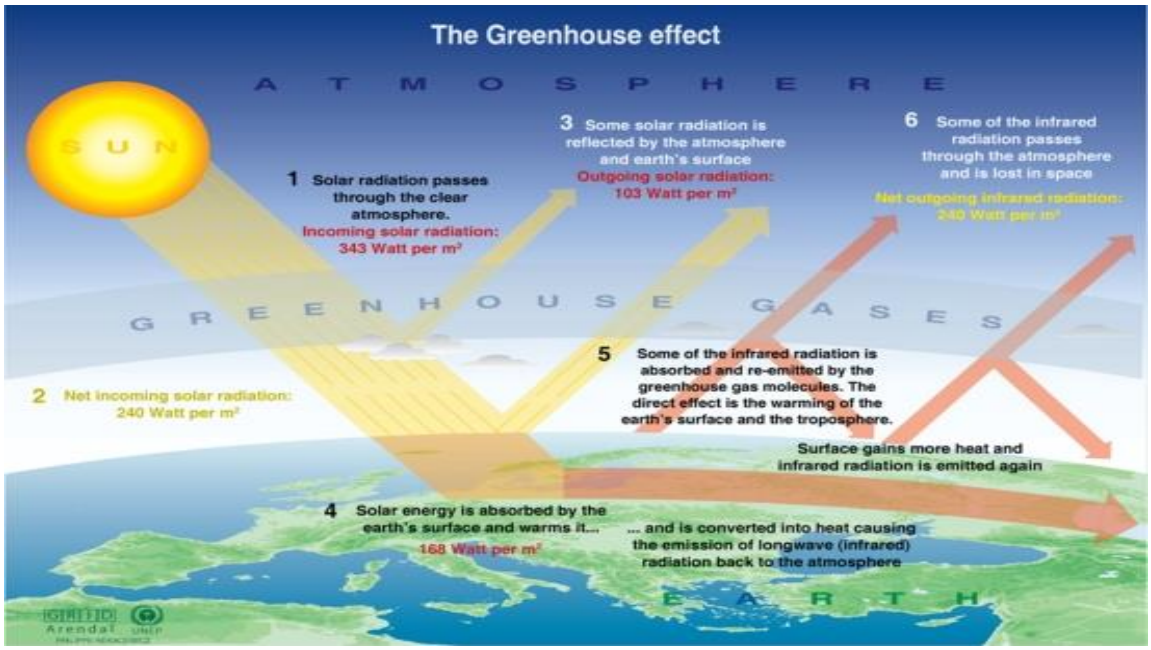

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী ৯টি গ্রীনহাউস গ্যাস হলো ঃ

১। কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2)
২। জলীয় বাষ্প (H_2O)
৩। মিথেন (CH_4)
৪। নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)
৫। ওজোন (O_3)
৬। ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC)
৭। হাইড্রোফ্লুরো কার্বন (HFCs)
৮। পারফ্লুরোকার্বন (PFCs)
৯। সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)

কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ

- বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড ৫০%, মিথেন ১৮% এবং নাইট্রাস অক্সাইড ১৬% দায়ী এবং এসকল গ্যাস মানুষের কৃতকর্মের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়;
- জীবাশ্ব জ্বালানী (Fossil Fuel) পোড়ানো এবং বনাঞ্চল ধ্বংস (Deforestation) এর কারণে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়;
- ওজোন ক্ষয়কারী পদার্থ (Depleting Substance) হিসাবে HFCs এবং PFCs ব্যবহৃত হয়;

- CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি নির্ভর করছে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রকৌশলগত কর্মকান্ডের উপর;
- শীতপ্রধান দেশে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য একপ্রকার কাঁচের ঘরের ব্যবহার হয়, যেখানে সূর্যের তাপ ধরে রেখে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য পর্যাপ্ত তাপমাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের ঘরকে গ্রীনহাউস বলে। তেমনিভাবে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ কিছু গ্যাস পৃথিবীর চারপাশে একটি আবরণ তৈরী করে আছে, যা গ্রীনহাউসের কাঁচের মতো ভূ-পৃষ্ঠের তাপ ধরে রাখে, এ সকল গ্যাসকে গ্রীনহাউস গ্যাস বলে। সাধারণভাবে দিনের বেলায় ভূ-পৃষ্ঠ সূর্যালোক হতে তাপ গ্রহণ করে আর রাতের বেলায় তা বিকিরণ করে। বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের আবরণ পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে বিকিরিত তাপ শোষণ করে ও পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে প্রতিফলিত করে এবং মহাশূন্যে চলে যেতে বাধা দেয়, ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলছে। এজন্য এ সকল গ্যাসকে গ্রীনহাউস গ্যাস বলে।

গ্রীনহাউস গ্যাস কেন বাড়ছে ঃ

গ্রীনহাউস গ্যাস	কেন বাড়ছে
কার্বন ডাই অক্সাইড	জীবের অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ, ডিজেল/পেট্রোল/অকটেন পোড়নো, গাছপালা কাটা ও বন উজাড় হওয়ার কারণে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি
মিথেন	জৈব বর্জ্য পচন, জলাভূমির উদ্ভিদ পচন
ক্লোরোফ্লুরো কার্বন	ফ্রীজ, এয়ারকন্ডিশন, এরোসল ইত্যাদি ব্যবহার
নাইট্রাস অক্সাইড	শিল্প-কারখানা থেকে উৎপাদন
সালফার ডাই অক্সাইড	শিল্প-কারখানা থেকে উৎপাদন

২. প্রাকৃতিক কারণ ঃ

ক) সৌর শক্তির তারতম্য (Solar Output) ঃ

সূর্য হল তাপ শক্তির উৎস। One theory অনুযায়ী সূর্য এক সময় খুব শীতল ছিল এবং সূর্যের গায়ে পানির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ক্রমে সূর্যের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে আজকের পর্যায়ে পৌছেছে। ধারণা করা হয় যে প্রাকৃতিক কারণেই এই তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এক সময় সূর্য বিস্ফোরিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে; গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে এ সৌরজগৎ; যা Ultimate Fate of the Univers নামে খ্যাত। Sun Spots এবং Berillium Isotop পরীক্ষায় দেখা গেছে বিগত কয়েক শতাব্দীতে Solar Activity বেড়ে গেছে যা জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাকে সমর্থন করে।

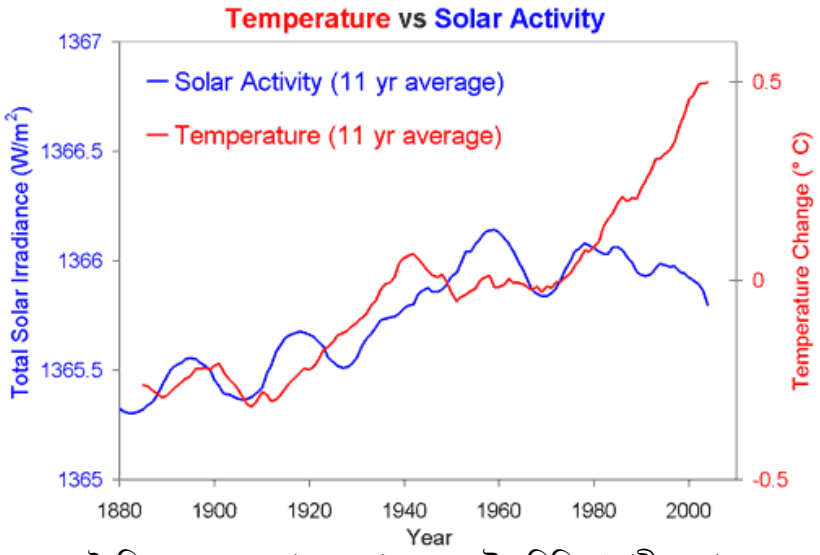

বৈশ্বিক তাপমাত্রা (লাল রং) এবং সৌর বিকিরণ (নীল রং)
[তথ্যসূত্রঃ নাসা ও ইন্টারনেট]

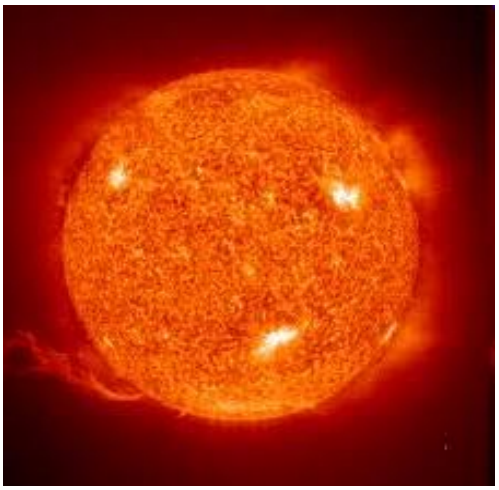

Sun Spots

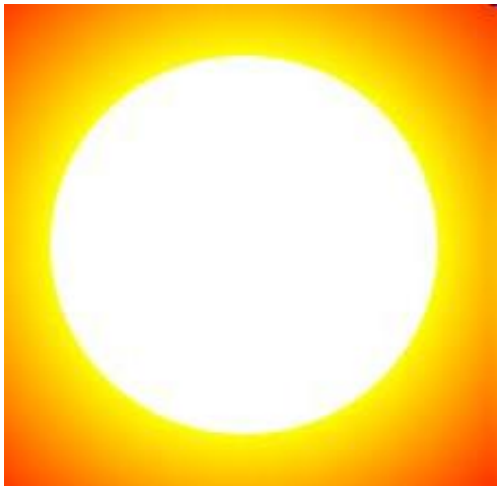

Solar Activity

খ) পৃথিবীর কক্ষীয় পরিবর্তন (Orbital Variations) ঃ

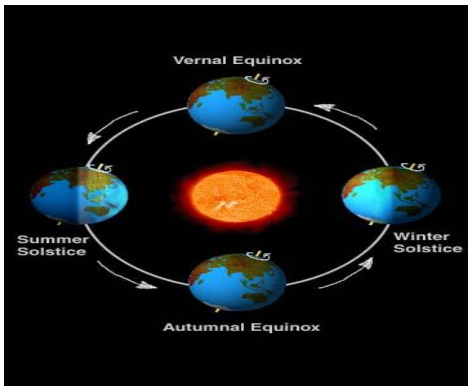

পৃথিবী তার নিজের কক্ষ পথের উপর ঘুরে থাকে এবং এ ঘূর্ণিজনিত অবস্থান পরিবর্তন হেতু ভূ-পৃষ্ঠে পতিত সূর্য কিরনের পরিবর্তন ঘটে। যা জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

গ) অগ্নুৎপাত (Volcanic Eruption) ঃ

আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে ভূ-গর্ভ থেকে প্রচন্ড উত্তপ্ত লাভা অতিরিক্ত চাপে উৎসারিত হয়। কোন একটি আগ্নেয়গিরি থেকে এক শতাব্দীতে কয়েকবার লাভা উৎসারিত হয়ে ওজোনসহ সেখানকার জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন Mount Pinatubo আগ্নেয়গিরি থেকে ১৯৯১ সালে এ শতাব্দীর ২য় সর্ববৃহৎ লাভা উৎসারিত হয় এবং প্রাকৃতিক জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ঘ) সামুদ্রিক স্রোতের তারতম্য (Ocean Variability) ঃ

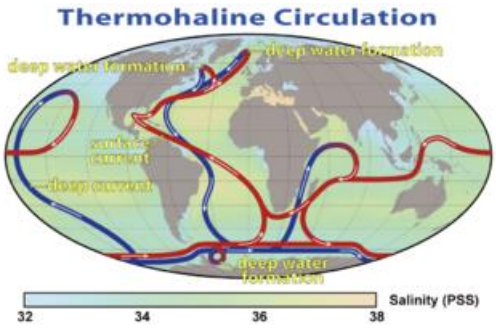

মহাসাগরের পৃষ্ঠের ও অভ্যন্তরের পানির তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে পানি প্রবাহের দিক নির্দিষ্ট হয়। বায়ুমন্ডলে ও সমুদ্রের এই প্রবাহের মিথস্ক্রিয়ার ফলে এক ধরণের দোলনের সৃষ্টি হয়। সময়ের পরিবর্তনে এই দোলন (Oscillation) এর কারণে স্থান ভেদে পানির তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় এবং পানি প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয় যা Thermohaline Circulation নামে পরিচিত। এটি জলবায়ু পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

ঙ) ক্রমাগমণ (Succession) ঃ

সময়ের সাথে কোন স্থানের বনের শ্রেণীর যে পরিবর্তন হয় তাকে ক্রমাগমণ বলে। ক্রমাগমণের ফলে বনের শ্রেণী পরিবর্তন হয়ে উদ্ভিদ ও বন্য প্রাণীর উপর প্রভাব ফেলে। পরিণতিতে মাটির গঠন পরিবর্তিত হয়, পরিবর্তন হয় জলবায়ুর।

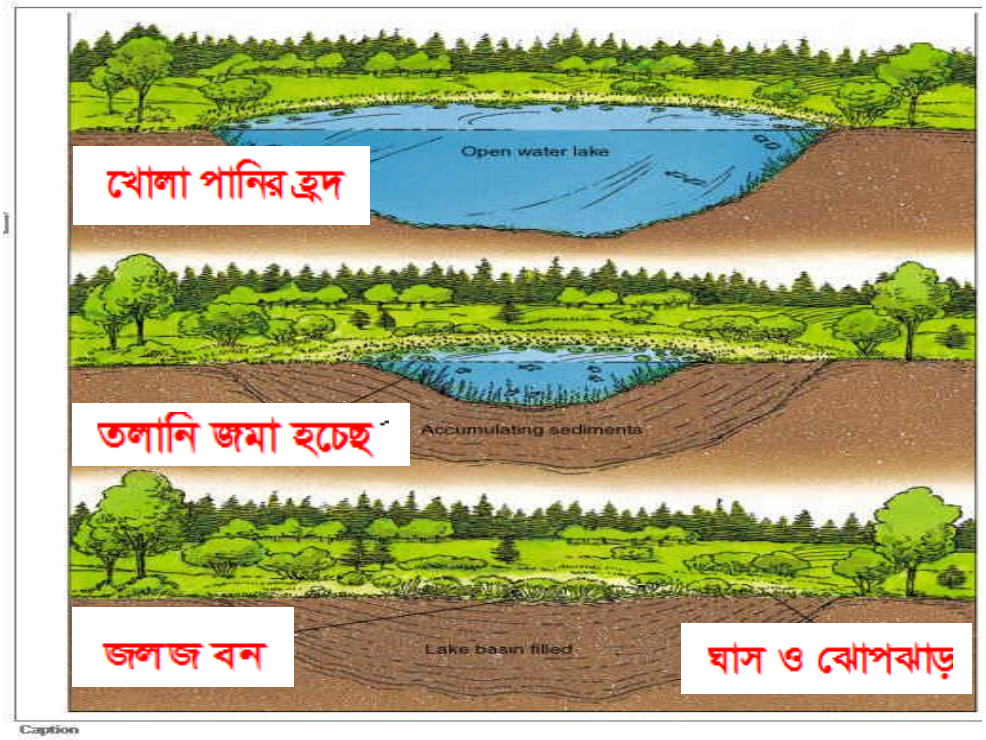

Caption
(a) What begins as a lake gradually fills with organic and inorganic sediments, which successively shrink the area of the pond. A bog forms, then a marshy area, and finally a meadow completes the successional stages. (b) Aquatic succession in a mountain lake. [Photo by Bobbé Christopherson.]

সাম্প্রতিক বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধির ধারা ঃ

বিশ্বের প্রত্যেক দেশের জলবায়ু আজ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। উষ্ণায়ন বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ওজোন স্তরের তারতম্যের ফলে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আজ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গী হয়েছে। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী (২০০৭) সংস্থা জাতিসংঘের আইপিসিসিসির তথ্যমতে, গত শতাব্দীতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৭° সে. বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালে এ তাপমাত্রা আরও ০.৬৫° সে. বাড়বে। পরবর্তীতে ২০৫০ সালে এ তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়াবে ১.৮° সে এবং ২১০০ সালে এর পরিমান হবে ২.৪° সে। প্রতিবেদনটিতে দেখা যায়, ২০৩০ সাল নাগাদ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত বাড়বে ৫ শতাংশ এবং ২১০০ সালে এ বৃদ্ধির হার গিয়ে দাঁড়াবে ১০ শতাংশে। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির তুলনায় শীতকালে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার হবে বেশি। অন্যদিকে শীতের তীব্রতা অনেকটাই কমে যাবে এবং গরমের মাত্রা ক্রমশ বাড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন দেশের বর্তমান বিভিন্ন সমস্যা ও প্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহের (Hazards) আরো অবনতি (Exacerbate) ঘটাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ দেখা দিবে তা হচ্ছে-
ঘন ঘন (Frequently) গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের হবে ও এর তীব্রতা (Intensity) বৃদ্ধি পাবে, ভারী ও অধিক অনিয়মিত (Erratic) বৃষ্টিপাত হবে। ফলে, নদী প্রবাহের উচ্চতা, উপকূলের ভাঙ্গন ও তলানী (Sedimentation) বৃদ্ধি পাবে, হিমালয়ের হিমবাহ (Glaciers) গলা বৃদ্ধি পাবে, কম ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হবে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে, এবং উষ্ণতা ও আর্দ্র আবহাওয়া বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখিত প্রত্যেকটি পরিবর্তনের ফলে ভয়াবহ হুমকির মুখে পড়বে প্রতিবেশ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড।

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্যোগ ঃ

- জলবায়ুর উপর মানুষের অন্যায় হস্তক্ষেপের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সর্বসাধারণ প্রথম জানতে পারে ১৯৭৯ সালে প্রথম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (World Climate Conference-WCC);
- ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৪৩/৫৩ কার্যবিবরণী গ্রহণ করে, যা মাল্টার সরকার কৃর্তক প্রস্তাবিত, যেখানে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপকারের জন্য বিশ্ব জলবায়ু রক্ষা করার কথা বলা হয়;
- একই বছর অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (World Meteorological Organization-WMO) পরিচালনা দল ও জাতিসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম (United Nations Environmental Programme-UNEP), জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তথ্য নিরূপণ ও তদারকি করার জন্য একটি নতুন দল গঠন করে যার নাম আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC);
- ১৯৯০ সালে আইপিসিসি প্রথম মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা নিশ্চিত করে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির সত্যতা। দ্বিতীয় বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালের শেষের দিকে, যেখানে বিশ্ব চুক্তির সূত্রের আহ্বান করা হয়;
- এ প্রেক্ষিতে সাধারণ পরিষদ ৪৫/২১২ কার্যবিবরণী পাশ করে যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা কার্যক্রম শুরু হয় জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন এর মাধ্যমে যা আন্তঃসরকার সমঝোতা কমিটি (Intergovernmental Negotiating Committee-INC) দ্বারা পরিচালিত হয়;
- ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে INC-র সম্মেলন হয় যার সরকারী প্রতিনিধিবৃন্দ ১৫ মাস আলাপ-আলোচনার পর ১৯৯২ সলের ৯ মে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামোর সম্মেলন (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) গ্রহণ করে;
- ১৯৯২ সালের জুন মাসে রিও ডি জেনেরিও-তে অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশ ও পৃথিবীর উন্নয়ন শীর্ষক জাতিসংঘের সম্মেলন, যেখানে স্বাক্ষরের জন্য সংলাপের নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। যাতে UNFCCC জোগ দেয় ১৯৯৪ সালের ২১ মার্চে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১৯৪টি রাষ্ট্র এ সম্মেলনে যোগ দেয়।

বাংলদেশে প্রধান জলবায়ু দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ঃ

প্রধান জলবায়ু দুর্যোগ ঃ

- তাপমাত্রা বৃদ্ধি
- অনিয়মিত বৃষ্টিপাত

যা ধীরে ঘটে ঃ

- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি
- খরা

চরম জলবায়ু দুর্যোগ ঃ

- বন্যা ও নদী ভাঙ্গন
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস
- ভূমি-ধস
- উচ্চ জোয়ার
- বজ্রপাত/কালবৈশাখী/টর্ণেডো

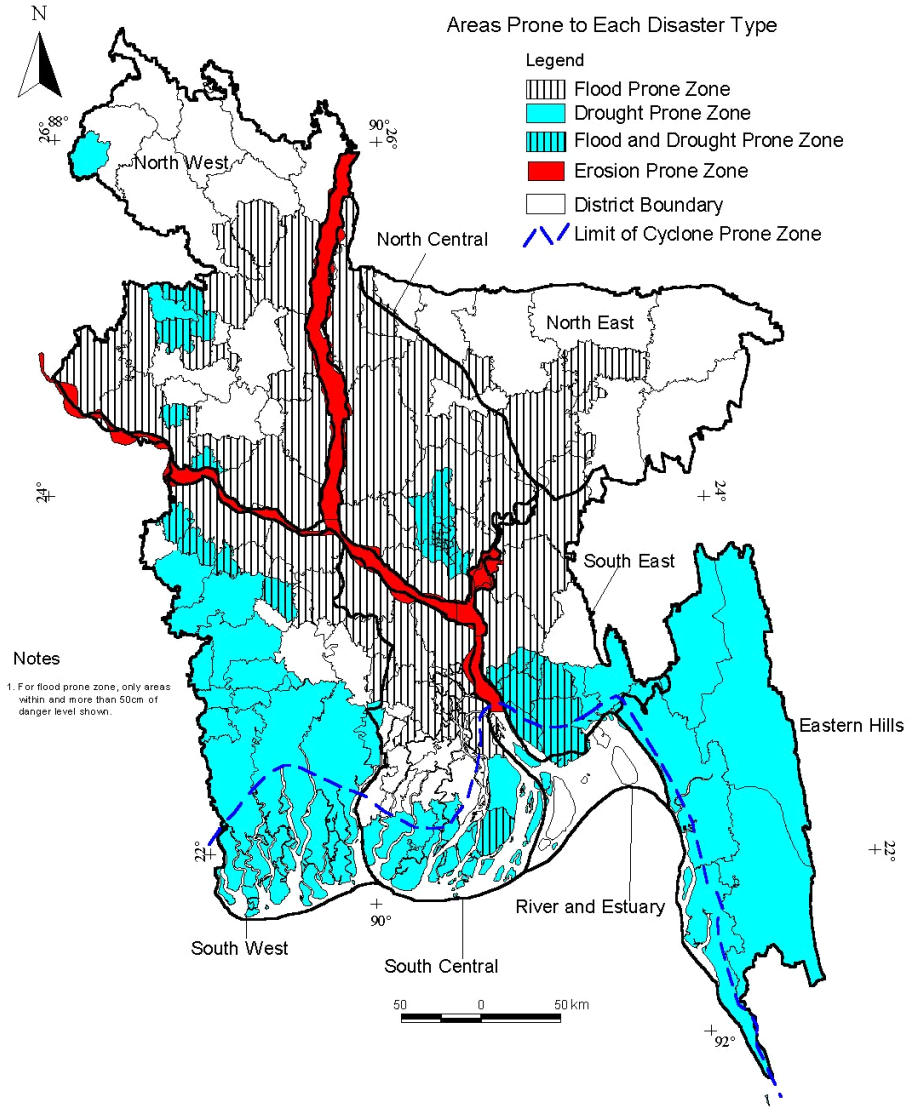

দুর্যোগ প্রবণ এলাকা

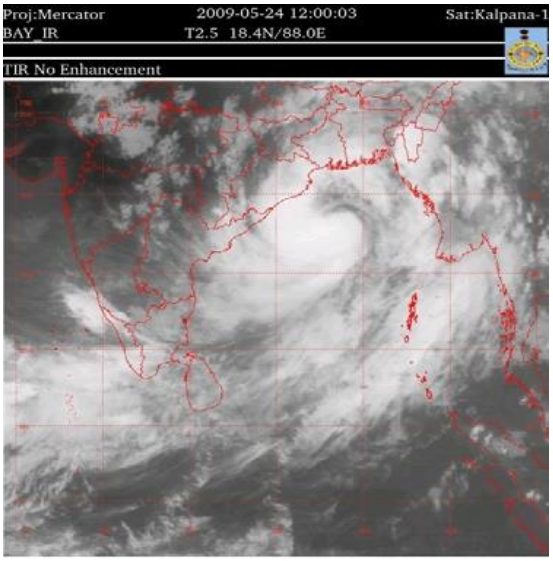

ঘূর্ণিঝড় আইলা

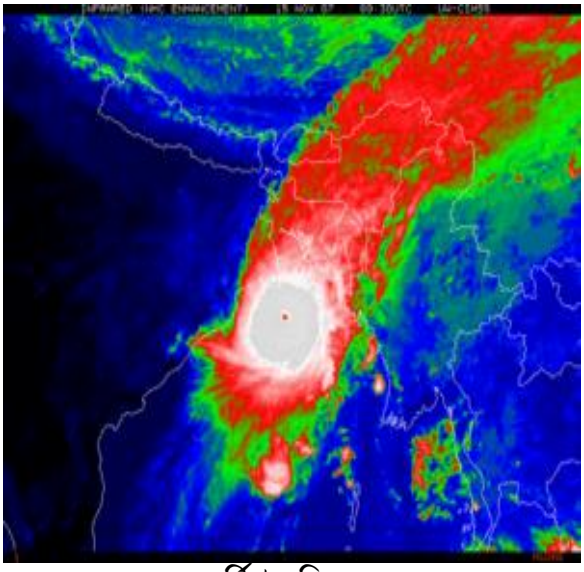

ঘূর্ণিঝড় সিডর

টর্ণেডো

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা

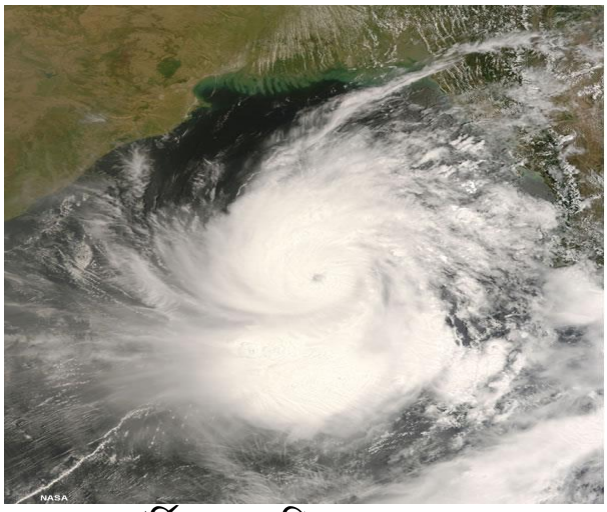

নার্গিস, ২৭ এপ্রিল-২ মে ২০০৮

একটানা বাতাসের গতিবেগ =২১০ কি.মি./ঘন্টা, দমকায় ২৪০-২৫৮ কি.মি./ঘন্টা

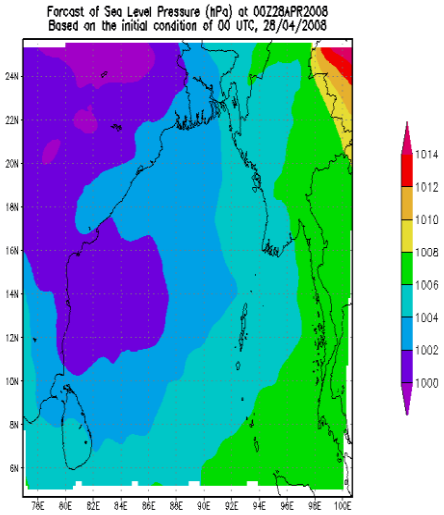

ঘূর্ণিঝড় নার্গিস সৃষ্টির সময় সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ুর চাপ (মডেল সৃষ্ট)

জলবায়ু উপাদানের পরিবর্তনের ফলে অভিঘাত, ঝুকি ও বিপন্নতাসমূহ ঃ

জলবায়ু উপাদানের পরিবর্তন	অভিঘাত, ঝুঁকি ও বিপন্নতা
তাপমাত্রা বৃদ্ধি	■ ঋতু পরিবর্তন, ফসলের ধরণ পরিবর্তন এবং ফসলের পরিবর্তন ■ পানি সম্পদের অবক্ষয়, স্বাস্থ্য হানি এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস ■ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের বিনাশ
বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি	■ হঠাৎ বন্যা, জলাবদ্ধতা এবং শস্য হানি ■ জলজ প্রাণী ও মৎস্য চাষের ক্ষতি
বৃষ্টিপাতের হ্রাস	■ শস্য উৎপাদন কমে যায় ■ পুকুর শুকিয়ে যায়, মাছ উৎপাদন কমে যায়
সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উচ্চ জোয়ার এবং জলাবদ্ধতা	■ নিম্নাঞ্চল লবনাক্ত পানি দ্বারা প্লাবিত হয় ■ কৃষি জমি নষ্ট হয় এবং ফসল উৎপাদন কমে যায় ■ সুপেয় পানির মৎস চাষ ব্যহত হয় ■ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়, সুপেয় পানির অভাব ঘটে ■ জলবায়ু শরণার্থী
লবনাক্ততা প্রবেশ(Salinity intrusion)	■ ফসল উৎপাদন কমে যায় ■ ভূমির অবক্ষয়, সুপেয় পানির মৎস্য চাষ ব্যহত হয় ■ মানুষের রোগ বৃদ্ধিঃ ডায়রিয়া, উচ্চরক্ত চাপ, একলামশিয়া
চরম দুর্যোগ (বন্যা, নদী ভঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, খরা)	■ পানি দূষিত হয়, সুপেয় পানির অভাব ঘটে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়, মৃতের হার বাড়ে, প্রাকৃতিক সম্পদের হানি ঘটে, জীবন-জীবিকা ধ্বংস হয়।

অঞ্চলভিত্তিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা ঃ

কক্সবাজার অঞ্চল ঃ

কক্সবাজারে ১৯৬১-২০১২ সময়ে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা ঃ

নীচের চিত্র হতে দেখা যায়, কক্সবাজারে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা বৃদ্ধির দিকে এবং এর হার প্রতি বছরে +০.০১৬২ সেঃ ।

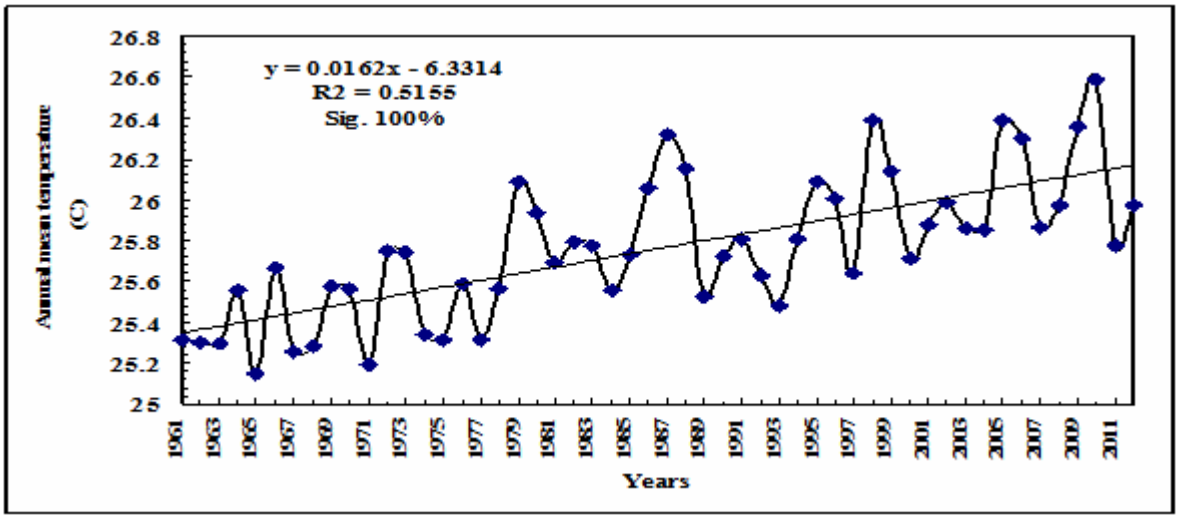

চিত্রঃ কক্সবাজারে ১৯৬১-২০১২ সময়কালে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা

কক্সবাজারে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

সাল	গড় বার্ষিক তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	গড় বার্ষিক তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./ বছর)
১৯৬১	২৫.৩২		২৫.৭৭	+০.০১৬২
১৯৮০	২৫.৯৪	+০.৬		
২০০০	২৫.৭১	-০.২৩		
২০১২	২৫.৯৮	০.২৭		

কক্সবাজারে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার প্রোজেকশন (ডিগ্রী সে.) ঃ

২০৩০ ও ২০৫০ সালে কক্সবাজারে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা হবে যথাক্রমে ২৬.৫৫ ডিগ্রী সে. ও ২৬.৮৮ ডিগ্রী সে.।

২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
২৬.৫৫ ডিগ্রী সে.	২৬.৮৮ ডিগ্রী সে.

১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঃ

নিম্নের সারণীতে **১৯৬১-১৯৯০** সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ২০৩০ ও ২০৫০ সালে কত হবে তা দেয়া হলো। কক্সবাজারে তাপমাত্রার পরিবর্তনের বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ তাপমাত্রার বৃদ্ধি পাবে **১.২৮** ডিগ্রী সে.।

১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা	**২০৩০ সাল**	**২০৫০ সাল**
২৫.৬ ডিগ্রী সে.	+০.৯৫ ডিগ্রী সে.	+১.২৮ ডিগ্রী সে.

কক্সবাজারে ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (Trends in seasonal temperatures) ঃ

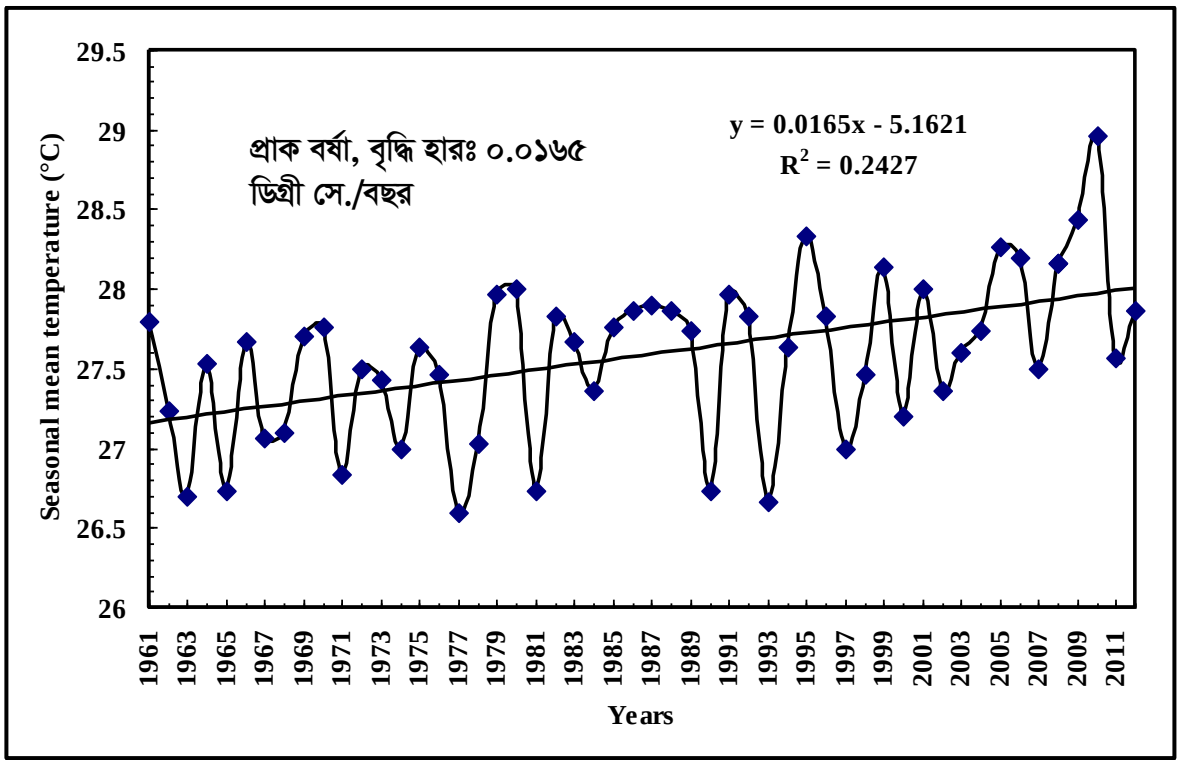

চিত্রঃ কক্সবাজারে ১৯৬১-২০১২ সময়কালে গরম কালে গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

গরম কালে কক্সবাজারে তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

নীচের সারণী গরম কালে কক্সবাজারে তাপমাত্রার পরিবর্তনে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৬১-২০১২ সময়কালে তাপমাত্রার বৃদ্ধির হার +০.০১৬৫ ডিগ্রী সে. (নীচের সারণী)।

সাল	গরম কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে গরম কালে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	গরম কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	গরম কালে তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./বছর)
১৯৬১	২৭.৮		২৭.৫৮	+০.০১৬৫
১৯৮০	২৮.০	+০.২		
২০০০	২৭.২	-০.৮		
২০১২	২৭.৯	+০.৮		

বর্ষা কালে কক্সবাজারে তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

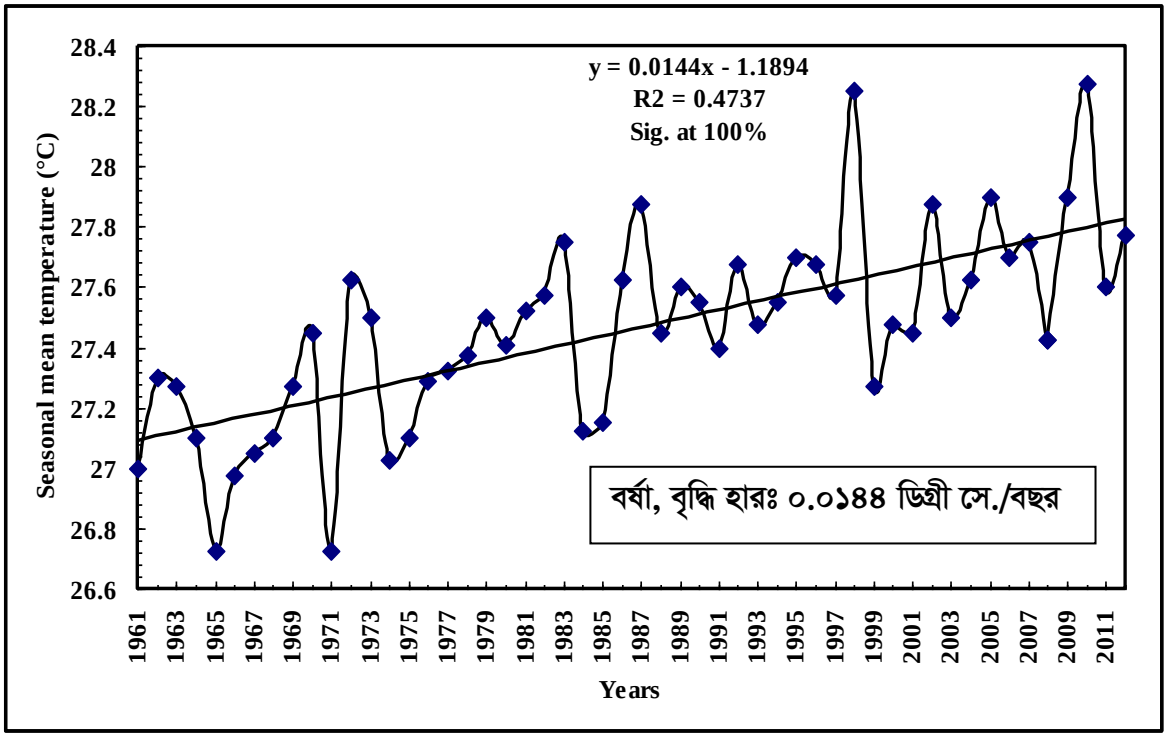

চিত্রঃ কক্সবাজারে ১৯৬১-২০১২ সময়কালে বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

বর্ষা কালে কক্সবাজারে তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

সাল	বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে বর্ষা কালে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	বর্ষা কালে তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./বছর)
১৯৬১	২৭.০		২৭.৪৬	+০.০১৪৪
১৯৮০	২৭.৪১	+০.৪১		
২০০০	২৭.৪৮	+০.০৭		
২০১২	২৭.৮০	+০.৩২		

কক্সবাজারে ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার প্রোজেকশন (ডিগ্রী সে.) ঃ

ঋতুর নাম	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
প্রাক বর্ষা ঋতু	২৮.৩৩	২৮.৬৬
বর্ষা ঋতু	২৮.০৪	২৮.৩৩

কক্সবাজারে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঃ

কক্সবাজারে বর্তমান গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা চলতে থাকলে গরম ও বর্ষা কালে ২০৫০ সালে কক্সবাজারের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে যথাক্রমে ১.২৫ ও ১.০২ ডিগ্রী সে. ।

ঋতুর নাম	১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	২০৩০ সাল (ডিগ্রী সে.)	২০৫০ সাল (ডিগ্রী সে.)
প্রাক বর্ষা ঋতু (গরম কাল)	২৭.৪১	+০.৯২	+১.২৫
বর্ষা ঋতু	২৭.৩১	+০.৭৩	+১.০২

কক্সবাজারে ১৯৪৮-২০১২ সময়ে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা (Trend in annual total rainfall at Cox's Bazar) ঃ

চিত্র থেকে দেখা যায়, কক্সবাজারে ১৯৪৮-২০১২ সময়ে কালে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ পরিবর্তনের প্রবণতার হার হচ্ছে প্রতি বছরে +২.৮৮৬ মি.মি.

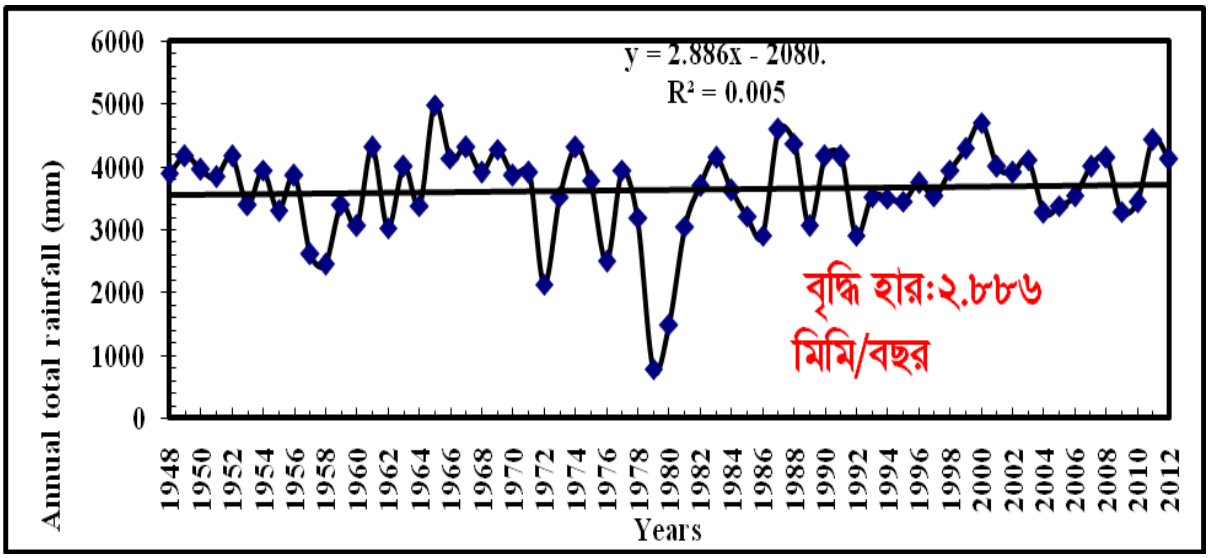

চিত্রঃ কক্সবাজারে ১৯৪৮-২০১২ সময় কালে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

কক্সবাজারে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬০	৩০৭০		৩৬৩৪	২.৮৮৬
১৯৮০	১৪৯০	-১৫৮০		
২০০০	৪৭০৭	+৩২১৭		
২০১২	৪১২৩	-৫৮৪		

কক্সবাজারে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রোজেকশন (মি.মি.) ঃ

কক্সবাজারে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের বর্তমান প্রবণতার হার চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ কক্সবাজারের বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত হবে ৩৮৩৬.১১৫ মি.মি. যা ভূমিধ্বস ও বনজ সম্পদের জন্য ক্ষতিকর হবে।

২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
৩৭৭৮.৩৮৩ মি.মি.	৩৮৩৬.১১৫ মি.মি.

কক্সবাজারে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি ঃ

নিম্নের সারণীতে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি ২০৩০ ও ২০৫০ সালে কত হবে তা দেয়া হলো। কক্সবাজারে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি পাবে ২৭৯.৬৫ মি.মি.। এর ফলে ভূমিধ্বস বেড়ে যাবে এবং বনজ সম্পদের ক্ষতি হবে।

১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
৩৫৫৬.৪৬ মি.মি.	+২২১.৯২ মি.মি.	+২৭৯.৬৫ মি.মি.

কক্সবাজারে ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রবণতা (মি.মি.) [Trends in seasonal total rainfall (mm) at Cox's Bazar] ঃ

কক্সবাজারে গরমকালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা বৃদ্ধির দিকে এবং এ বৃদ্ধি হার প্রতি বছরে ২.৮৮০৯ মি.মি.।

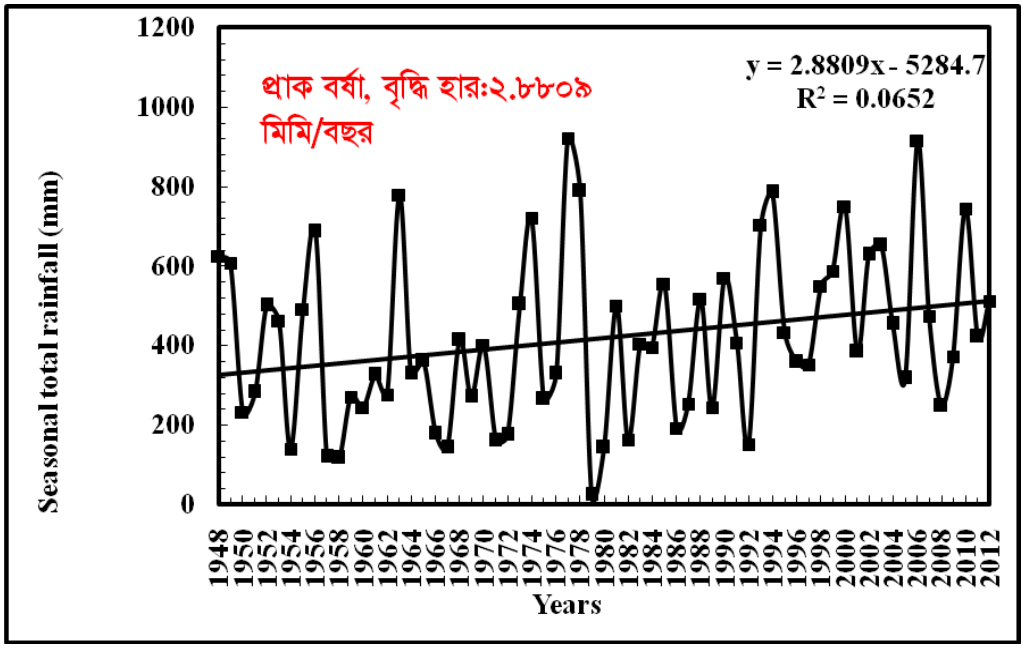

চিত্রঃ কক্সবাজারে ১৯৪৮-২০১২ সময়ে গরমকালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা
(তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

গরম কালে কক্সবাজারে মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	গরম কালে মোট বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে গরম কালে মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	গরম কালে গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	গরম কালে মোট বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬০	২৪৪		৪১৯.৫৫	২.৮৮০৯
১৯৮০	১৪৪	- ১০০		
২০০০	৭৫০	+৬০৬		
২০১২	৫১১	-২৩৯		

কক্সবাজারে ১৯৪৮-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা ঃ

কক্সবাজারে ১৯৪৮-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ বৃদ্ধির হার প্রতি বছরে +০.০৪৭ মি.মি. ।

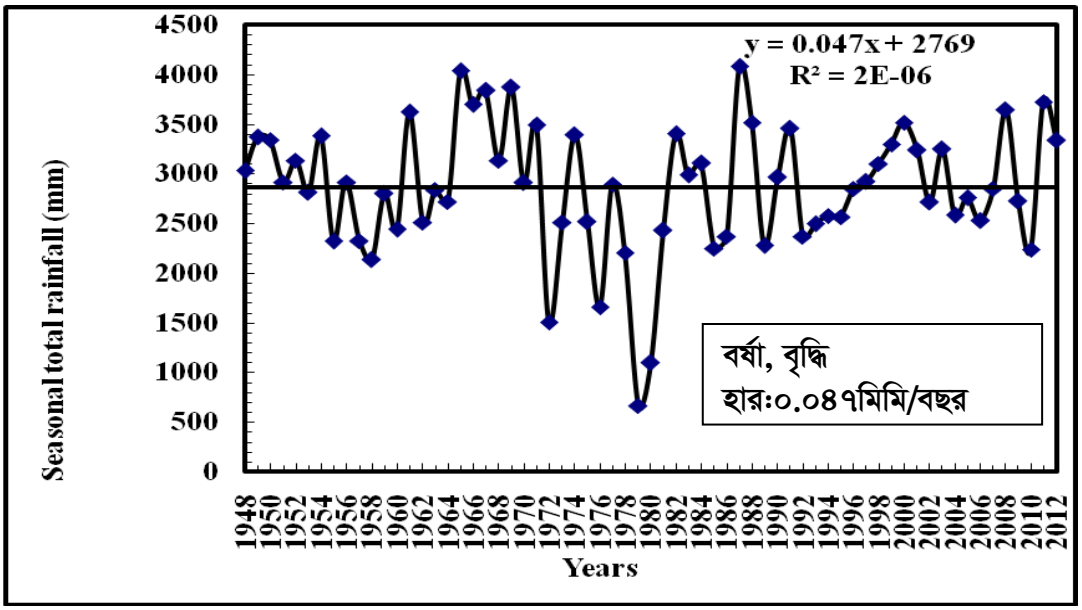

চিত্রঃ কক্সবাজারে ১৯৪৮-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

বর্ষা কালে কক্সবাজারে মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	বর্ষা বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	বর্ষা কালে গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬০	২৪৩৯		২৮৬৩	+ ০.০৪৭
১৯৮০	১০৯৫	-১৩৪৪		
২০০০	৩৫১৪	+২৪১৯		
২০১২	৩৩৩৫	-১৭৯		

কক্সবাজারে ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রোজেকশন (মি.মি.) ঃ

ঋতুর নাম	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
প্রাক বর্ষা ঋতু	৫৬৩.৫২৭	৬২১.১৪৫
বর্ষা ঋতু	২৮৬৪.৮১৬	২৮৬৫.৭৬

কক্সবাজারে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাতের তুলনায় ভবিষ্যতে ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি (মি. মি.) ঃ

কক্সবাজারে বর্তমান বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের ধারা চলতে থাকলে, ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাতের তুলনায় ২০৫০ সালে গরম ও বর্ষা কালে বৃষ্টি বেশী হবে যথাক্রমে ২৪৪.৪৮ মি.মি. ও ৫০.৭০ মি.মি.।

ঋতুর নাম	১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাত	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
প্রাক বর্ষা ঋতু (গরম কাল)	৩৭৬.৬৭	+১৮৬.৮৬	+২৪৪.৪৮
বর্ষা ঋতু	২৮১৫.০৭	+৪৯.৭৫	+৫০.৭০

চট্টগ্রাম অঞ্চল ঃ

নীচের চিত্র হতে দেখা যায়, চট্টগ্রামে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা বৃদ্ধির দিকে এবং এর হার প্রতি বছরে +০.০১৭৬ ডিগ্রী সে. ।

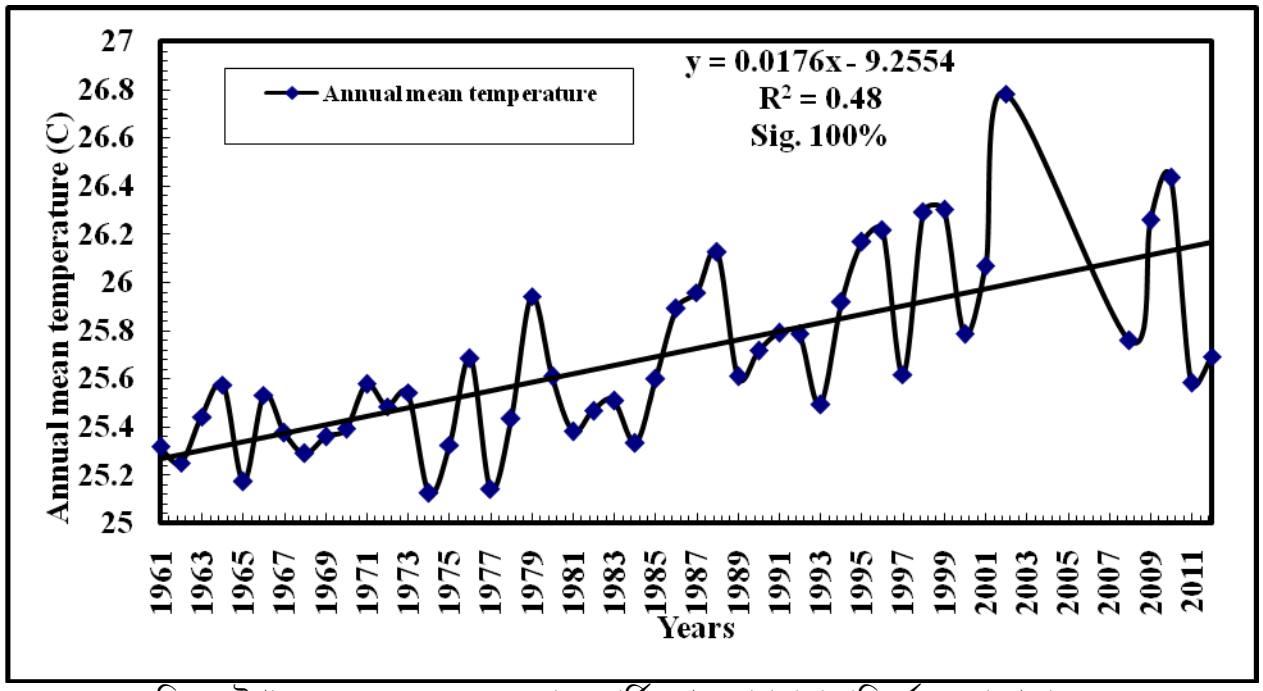

চিত্রঃ চট্টগ্রামে ১৯৬১-২০১২ সময়কালে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা

চট্টগ্রামে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

সাল	গড় বার্ষিক তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	গড় বার্ষিক তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	বার্ষিক তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./বছর)
১৯৬১	২৫.৩২		২৫.৬৮	+০.০১৭৬
১৯৮০	২৫.৬১	+০.২৯		
২০০০	২৫.৭৮	+০.১৭		
২০১২	২৫.৬৯	-.১৮		

চট্টগ্রামে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার প্রোজেকশন (ডিগ্রী সে.) ঃ

২০৩০ ও ২০৫০ সালে চট্টগ্রামের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা হবে যথাক্রমে ২৬.৫৫ ডিগ্রী সে. ও ২৬.৮৮ ডিগ্রী সে.।

২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
২৬.৪৭ ডিগ্রী সে.	২৬.৮২ ডিগ্রী সে.

চট্টগ্রামে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঃ

নিম্নের সারণীতে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ২০৩০ ও ২০৫০ সালে কত হবে তা দেয়া হলো। চট্টগ্রামে তাপমাত্রার পরিবর্তনের বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ তাপমাত্রার বৃদ্ধি পাবে ১.৩১ ডিগ্রী সে.।

১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
২৫.৫১ ডিগ্রী সে.	+০.৯৬ ডিগ্রী সে.	+১.৩১ ডিগ্রী সে.

চট্টগ্রামে ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (Trends in seasonal temperatures) ঃ

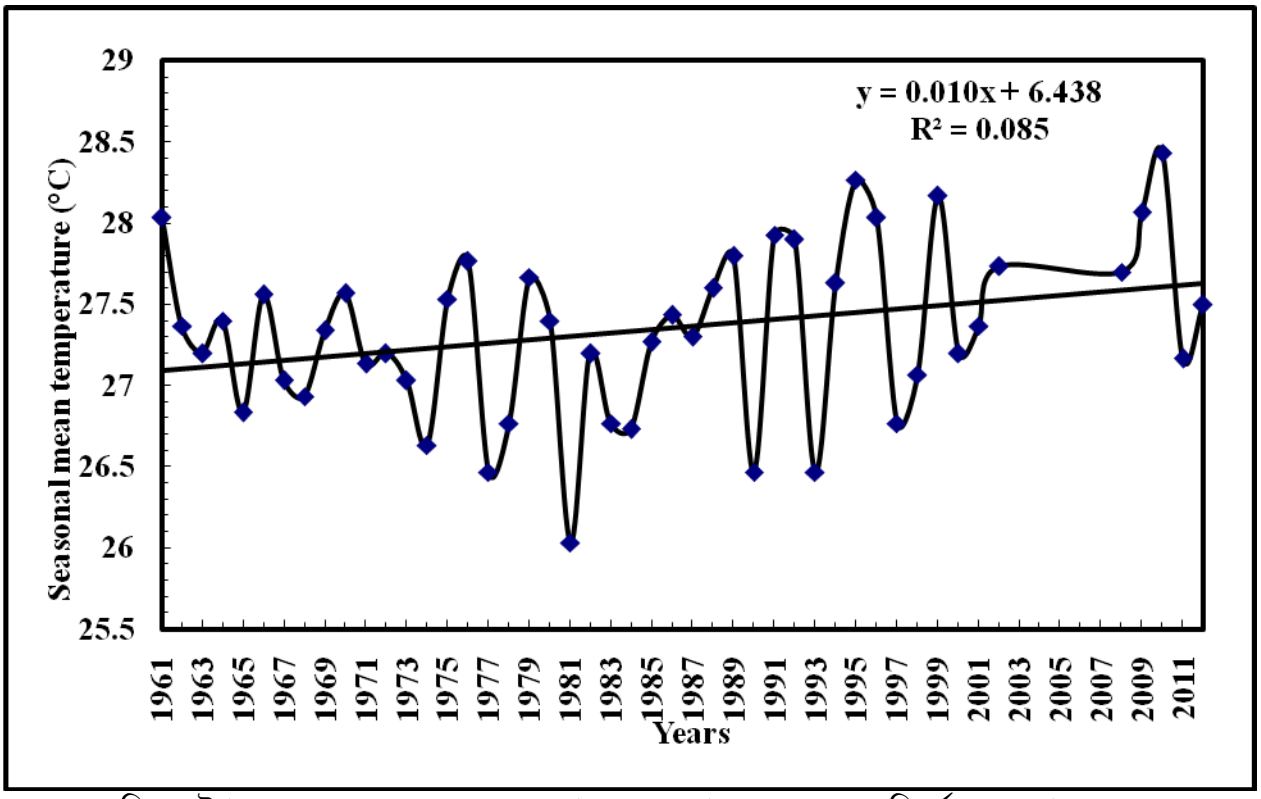

চিত্রঃ চট্টগ্রামে ১৯৬১-২০১২ সময়কালে গরম কালে গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

গরম কালে চট্টগ্রামে তাপমাত্রার অবস্থাঃ

নীচের সারণী গরম কালে চট্টগ্রামে তাপমাত্রার পরিবর্তনে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৬১-২০১২ সময়কালে তাপমাত্রার বৃদ্ধির হার +০.০১০ ডিগ্রী সে. (নীচের সারণী)।

সাল	গরম কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে গরম কালে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	গরম কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	গরম কালে তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./বছর)
১৯৬১	২৮.০৩		২৭.	+০.০১০
১৯৮০	২৭.৪	-০.৬৩		
২০০০	২৭.২	+০.২০		
২০১২	২৭.৫	+০.৩০		

বর্ষা কালে চট্টগ্রামে তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

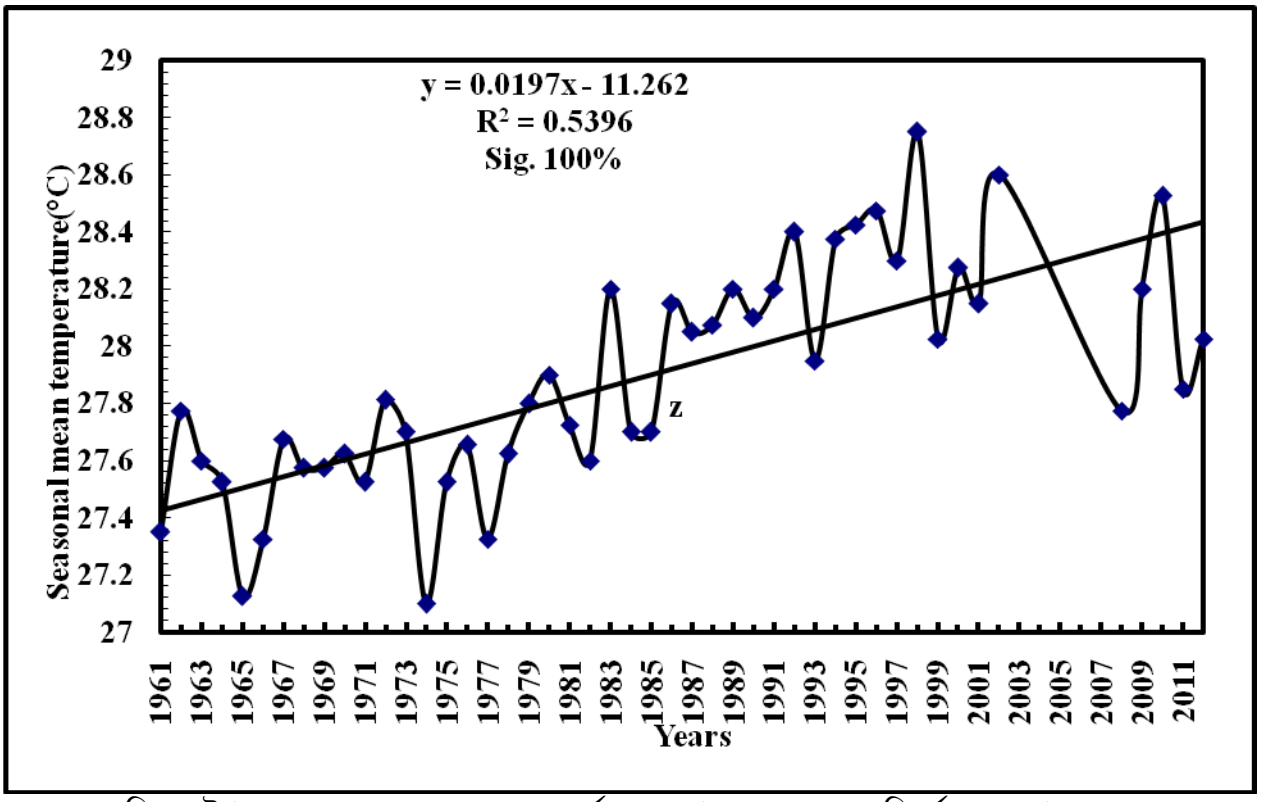

চিত্রঃ চট্টগ্রামে ১৯৬১-২০১২ সময়কালে বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

বর্ষা কালে চট্টগ্রামে তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

সাল	বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে বর্ষা কালে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	বর্ষা কালে তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./বছর)
১৯৬১	২৭.৩৫		২৭.৮৯	+০.০১৯৭
১৯৮০	২৭.৯০	+০.৫৫		
২০০০	২৮.২৮	+০.৩৮		
২০১২	২৮.০৩	-০.২৫		

চট্টগ্রামে ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার প্রোজেকশন (ডিগ্রী সে.) ঃ

ঋতুর নাম	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
প্রাক বর্ষা ঋতু	২৭.৭৫	২৭.৯৬
বর্ষা ঋতু	২৮.৭৩	২৯.১২

চট্টগ্রামে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঃ

চট্টগ্রামে বর্তমান গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা চলতে থাকলে গরম ও বর্ষা কালে ২০৫০ সালে চট্টগ্রামের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে যথাক্রমে ০.৭৮ ও ১.৪৩ ডিগ্রী সে. ।

ঋতুর নাম	১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	২০৩০ সাল (ডিগ্রী সে.)	২০৫০ সাল (ডিগ্রী সে.)
প্রাক বর্ষা ঋতু (গরম কাল)	২৭.১৮	+০.৫৭৩৮	+০.৭৮৩৮
বর্ষা ঋতু	২৭.৬৯	+১.০৩৯	১.৪৩৩

চট্টগ্রামে ১৯৪৯-২০১২ সময়ে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা (**Trend in annual total rainfall at Chittagong**) ঃ

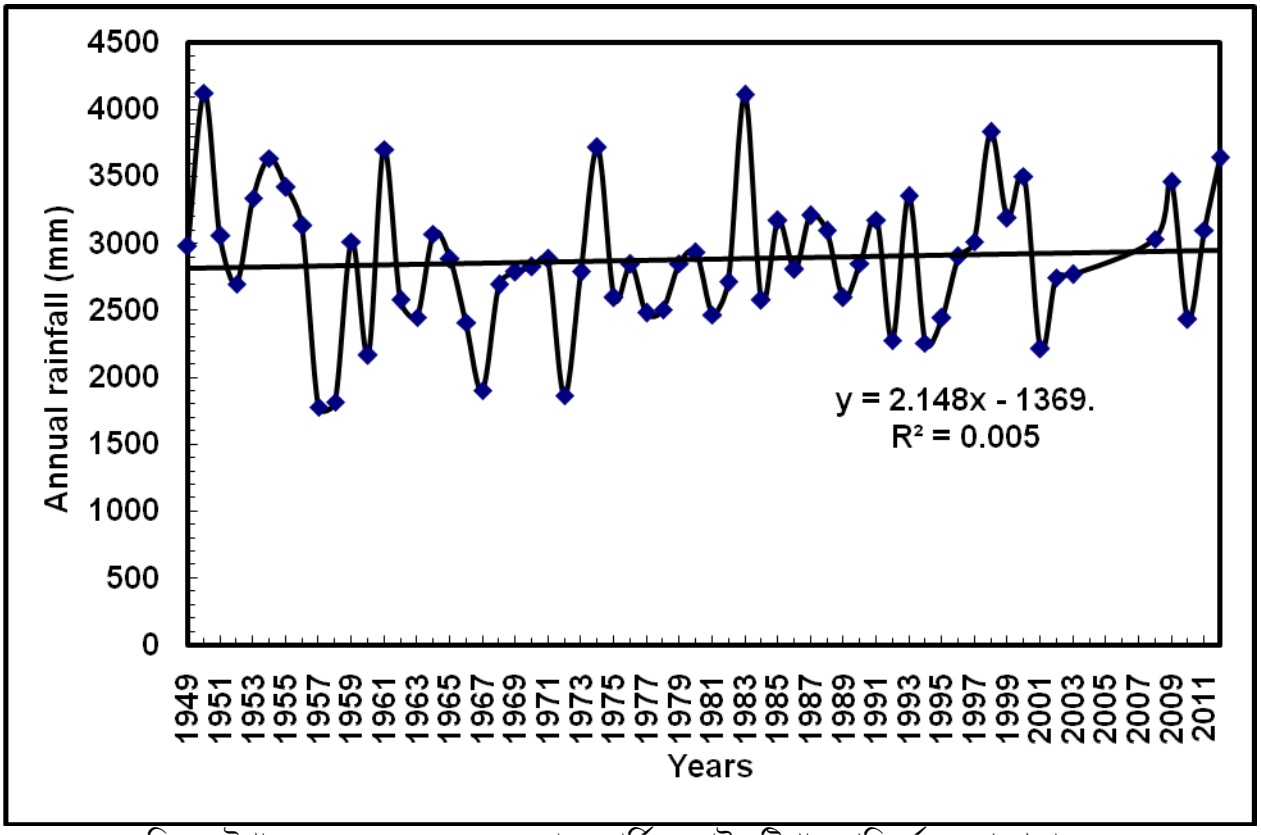

চিত্রঃ চট্টগ্রামে ১৯৪৯-২০১২ সময় কালে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

চট্টগ্রামে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬০	৩৭০২		২৮৬৮.৮০	+২.১৪৮
১৯৮০	২৯৩২	-৭৭০		
২০০০	৩৫০৩	+৫৭১		
২০১২	৩৬৪৩	১৪০		

চট্টগ্রামে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রোজেকশন (মি.মি.) ঃ

চট্টগ্রামে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের বর্তমান প্রবণতার হার চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ চট্টগ্রামে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত হবে ৩০৩৪.৫৩ মি.মি. যা ভূমিধ্বস ও বনজ সম্পদের জন্য ক্ষতিকর হবে।

২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
২৯৯১.৫৬ মি.মি.	৩০৩৪.৫৩ মি.মি.

চট্টগ্রামে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি ঃ

নিম্নের সারণীতে চট্টগ্রামে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি ২০৩০ ও ২০৫০ সালে কত হবে তা দেয়া হলো। চট্টগ্রামে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি পাবে ২৭৯.৬৫ মি.মি.। এর ফলে ভূমিধ্বস বেড়ে যাবে এবং বনজ সম্পদের ক্ষতি হবে।

১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
২৮১১.৩৮ মি.মি.	+১৮০.১৮ মি.মি.	+২২৩.১৫ মি.মি.

চট্টগ্রামে ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রবণতা (মি.মি.) [Trends in seasonal total rainfall at Chittagong (mm)] ঃ

চট্টগ্রামে গরমকালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা বৃদ্ধির দিকে এবং এ বৃদ্ধি হার প্রতি বছরে +২.৬০৯ মি.মি.।

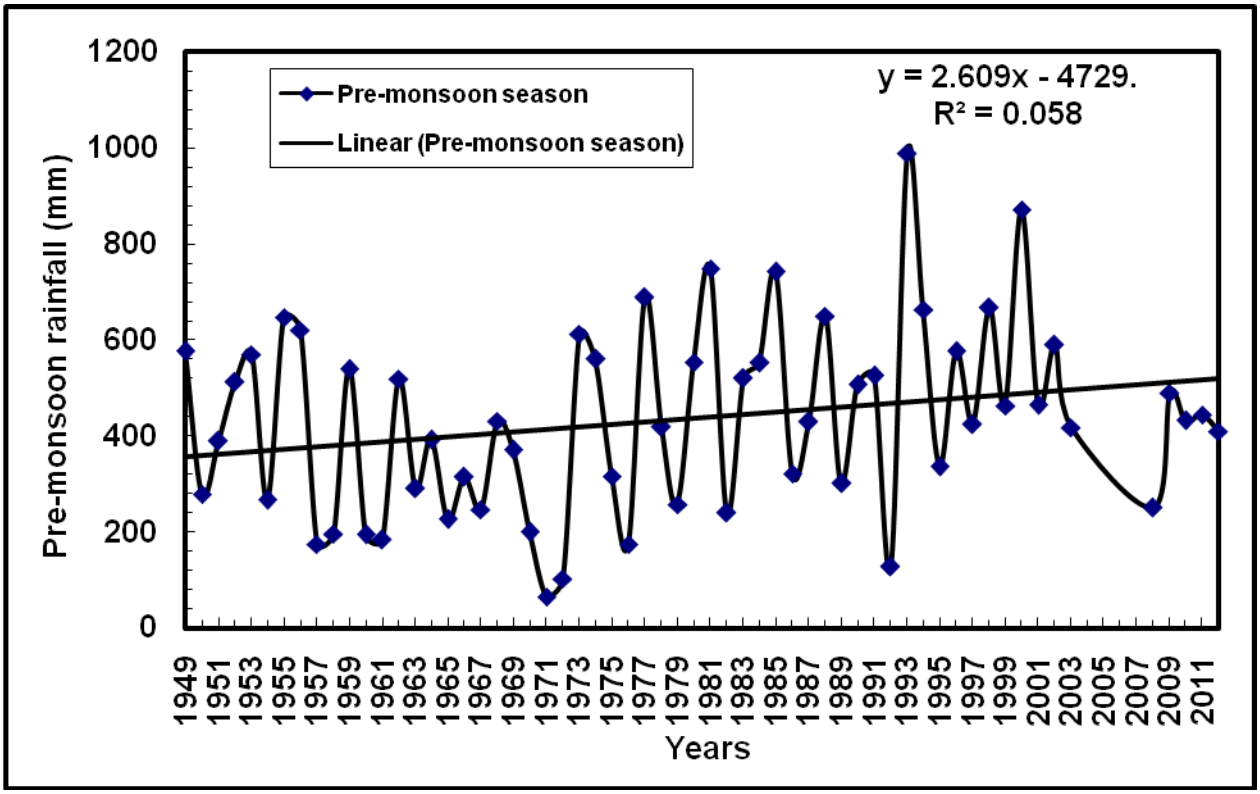

চিত্রঃ চট্টগ্রামে ১৯৪৯-২০১২ সময়ে গরমকালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

গরম কালে চট্টগ্রামে মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	গরম কালে মোট বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে গরম কালে মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	গরম কালে গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	গরম কালে মোট বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬০	১৯৪		৪৩৪.৩৬	+ ২.৬০৯
১৯৮০	৫৫৪	৩৬০		
২০০০	৮৭২	৩১৮		
২০১২	৪১০	-৪৬২		

চট্টগ্রামে ১৯৪৯-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা ঃ

চট্টগ্রামে ১৯৪৯-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে এবং এ হ্রাসের হার প্রতি বছরে -১.০১৭ মি.মি. ।

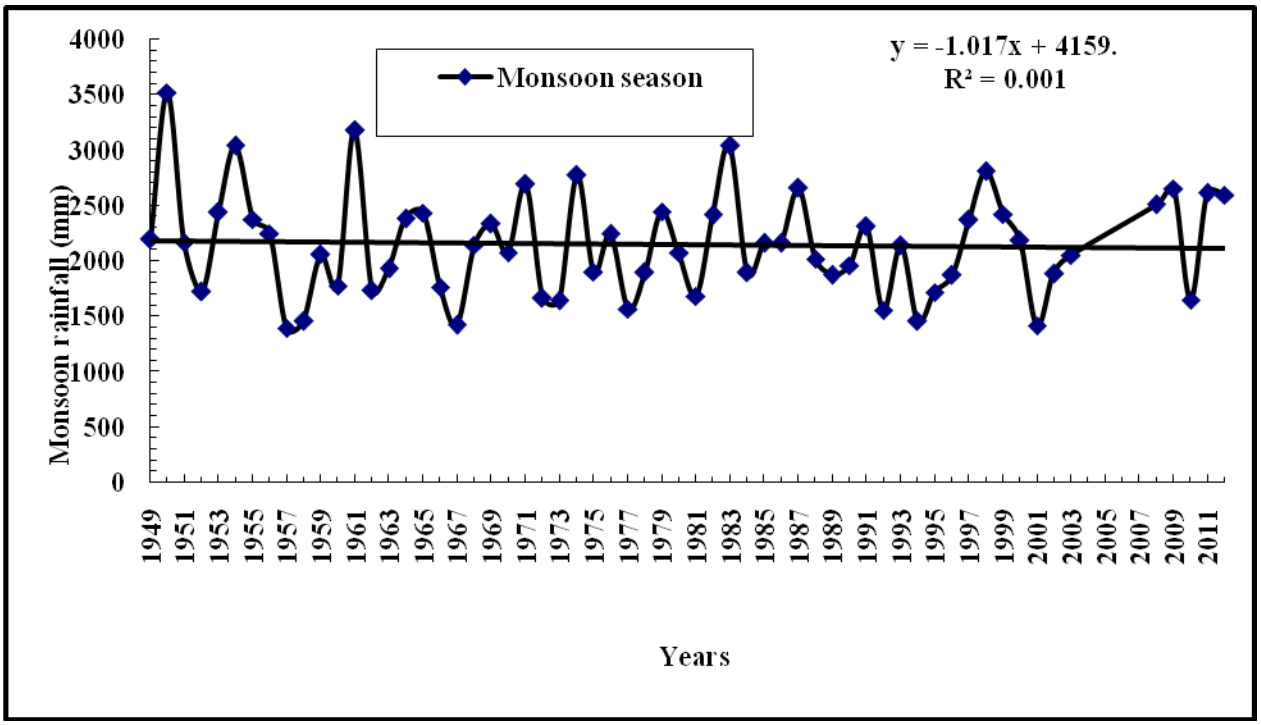

চিত্রঃ চট্টগ্রামে ১৯৪৮-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা
(তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

বর্ষা কালে চট্টগ্রামে মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	বর্ষা বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	বর্ষা কালে গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬০	১৭৭৪		২১৪৬.১৮	-১.০১৭
১৯৮০	২০৭৫	৩০১		
২০০০	২১৮৩	১০৮		
২০১২	২৫৯৪	৪১১		

চট্টগ্রামে ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রোজেকশন (মি.মি.) ঃ

ঋতুর নাম	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
প্রাক বর্ষা ঋতু	৫৬৭.৮৯	৬২০.০৮
বর্ষা ঋতু	২০৯৪.৮	২০৭৩.৭৩

চট্টগ্রামে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাতের তুলনায় ভবিষ্যতে ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন (মি. মি.) ঃ

চট্টগ্রামে বর্তমান বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের ধারা চলতে থাকলে, ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাতের তুলনায় ২০৫০ সালে গরম বৃষ্টি বেশী হবে যথাক্রমে ২২৫.৭৬৮ মি.মি. ও বর্ষা কালে বৃষ্টি কম হবে ৬৫.৫ মি.মি.।

ঋতুর নাম	১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাত	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
প্রাক বর্ষা ঋতু (গরম কাল)	৩৯৪.৩২	১৭৩.৫৭	২২৫.৭৬
বর্ষা ঋতু	২১৩৯.২৩	-৪৫.১৫	-৬৫.৫

খুলনা অঞ্চল ঃ

নীচের চিত্র হতে দেখা যায়, খুলনায় বার্ষিক গড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের হ্রাস বা বৃদ্ধির কোন প্রবণতা নেই।

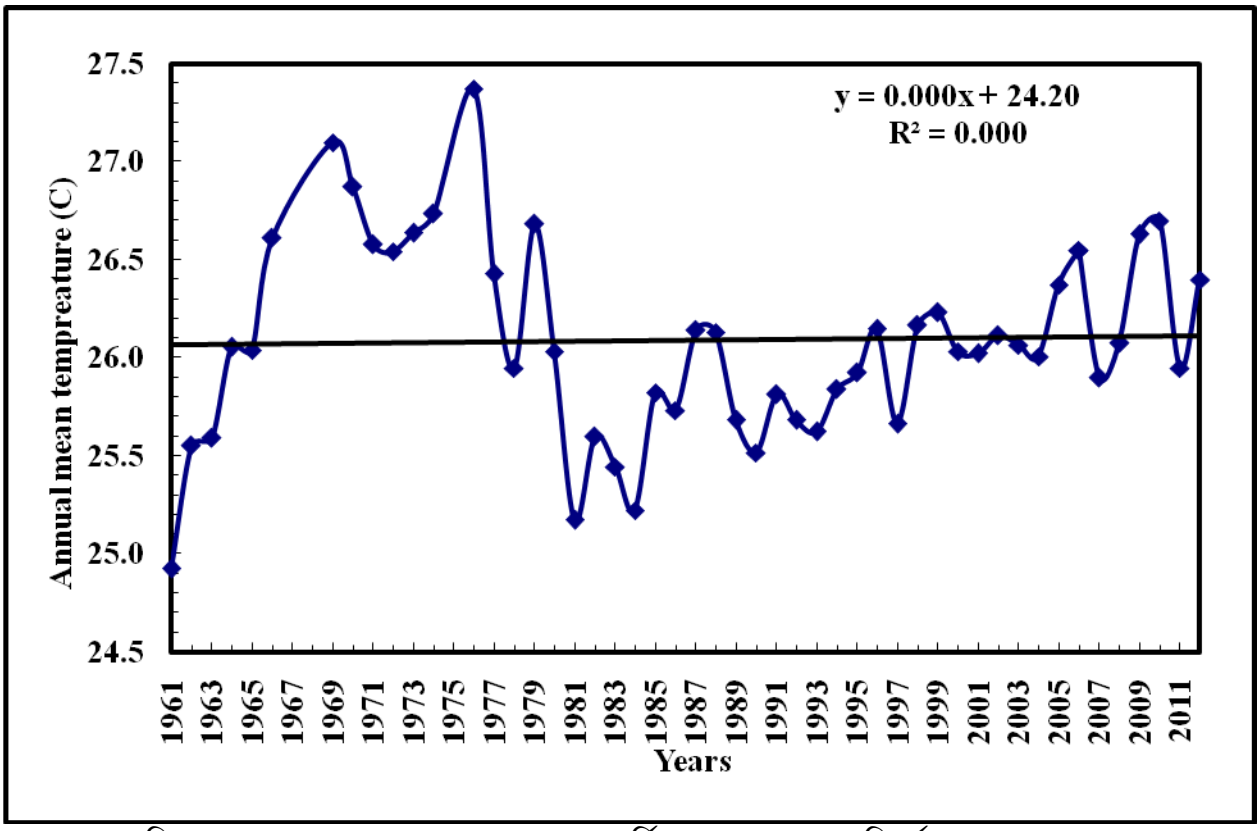

চিত্রঃ খুলনাতে ১৯৬১-২০১২ সময়কালে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা

খুলনায় বার্ষিক গড় তাপমাত্রার অবস্থাঃ

সাল	গড় বার্ষিক তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	গড় বার্ষিক তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	বার্ষিক তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./বছর)
১৯৬১	২৪.৯		২৬.১	০.০০
১৯৮০	২৬.০	+১.১		
২০০০	২৬.০	+০.০		
২০১২	২৬.৪	+০.৪		

খুলনায় বার্ষিক গড় তাপমাত্রার প্রোজেকশন (ডিগ্রী সে.) ঃ

২০৩০ ও ২০৫০ সালে খুলনায় বার্ষিক গড় তাপমাত্রা হবে যথাক্রমে ২৬.০৫ ডিগ্রী সে. ও ২৬.০৫ ডিগ্রী সে.।

২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
২৬.০৩	২৬.০৫

খুলনায় ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঃ

নিম্নের সারণীতে খুলনায় ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ২০৩০ ও ২০৫০ সালে কত হবে তা দেয়া হলো। খুলনায় তাপমাত্রার পরিবর্তনের বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ তাপমাত্রার কমে যাবে ০.০৩ ডিগ্রী সে.।

১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
২৬.০৮৬ ডিগ্রী সে.	-০.০৫ ডিগ্রী সে.	-০.০৩ ডিগ্রী সে.

খুলনায় ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (Trends in seasonal temperatures) ঃ

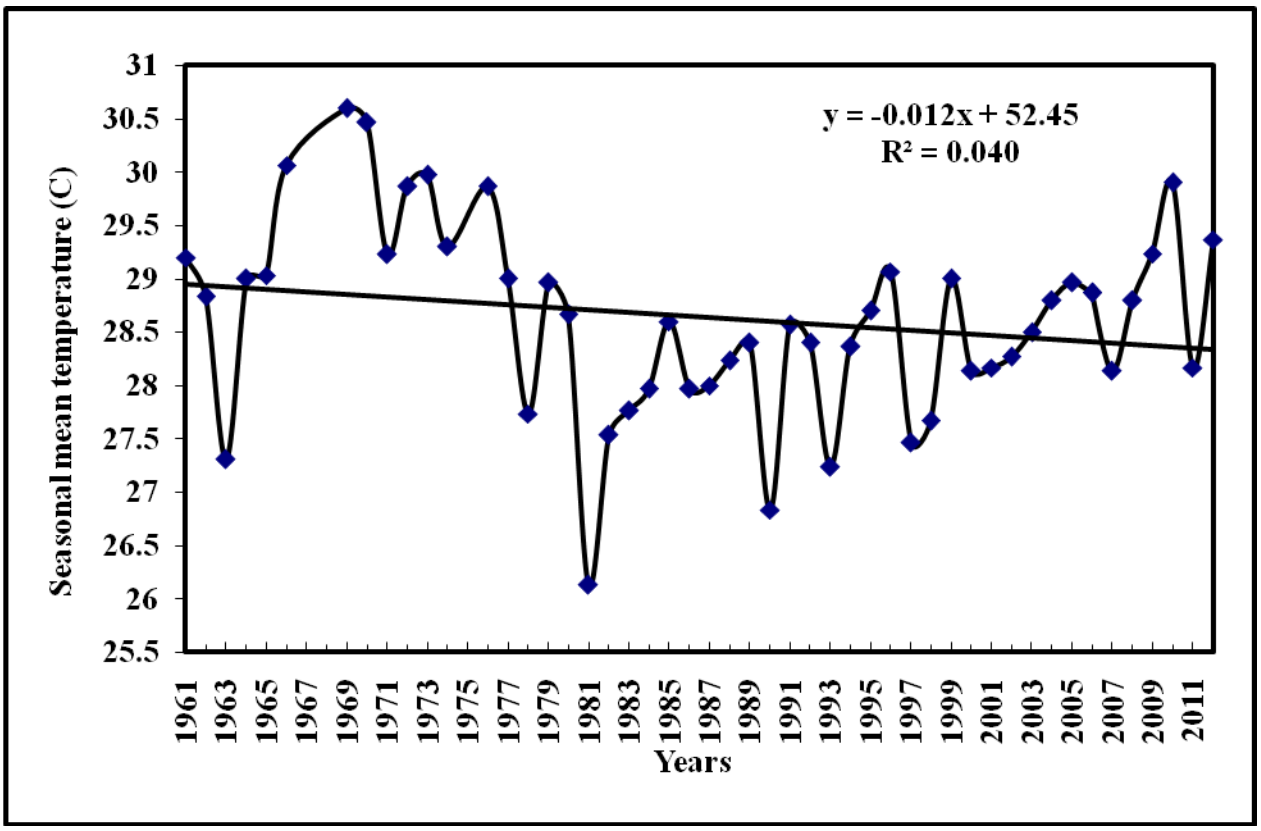

চিত্রঃ খুলনায় ১৯৬১-২০১২ সময়কালে গরম কালে গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

গরম কালে খুলনায় তাপমাত্রার অবস্থাঃ

নীচের সারণী গরম কালে খুলনায় তাপমাত্রার পরিবর্তনে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৬১-২০১২ সময়কালে তাপমাত্রার হ্রাসের হার -০.০১২ ডিগ্রী সে. (নীচের সারণী)।

সাল	গরম কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে গরম কালে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	গরম কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	গরম কালে তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./বছর)
১৯৬১	২৯.২		২৮.৬১	-০.০১২
১৯৮০	২৮.৬৭	-০.৫৩		
২০০০	২৮.০০	-০.৬৭		
২০১২	২৯.৩৭	+১.৩৭		

বর্ষা কালে খুলনায় তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

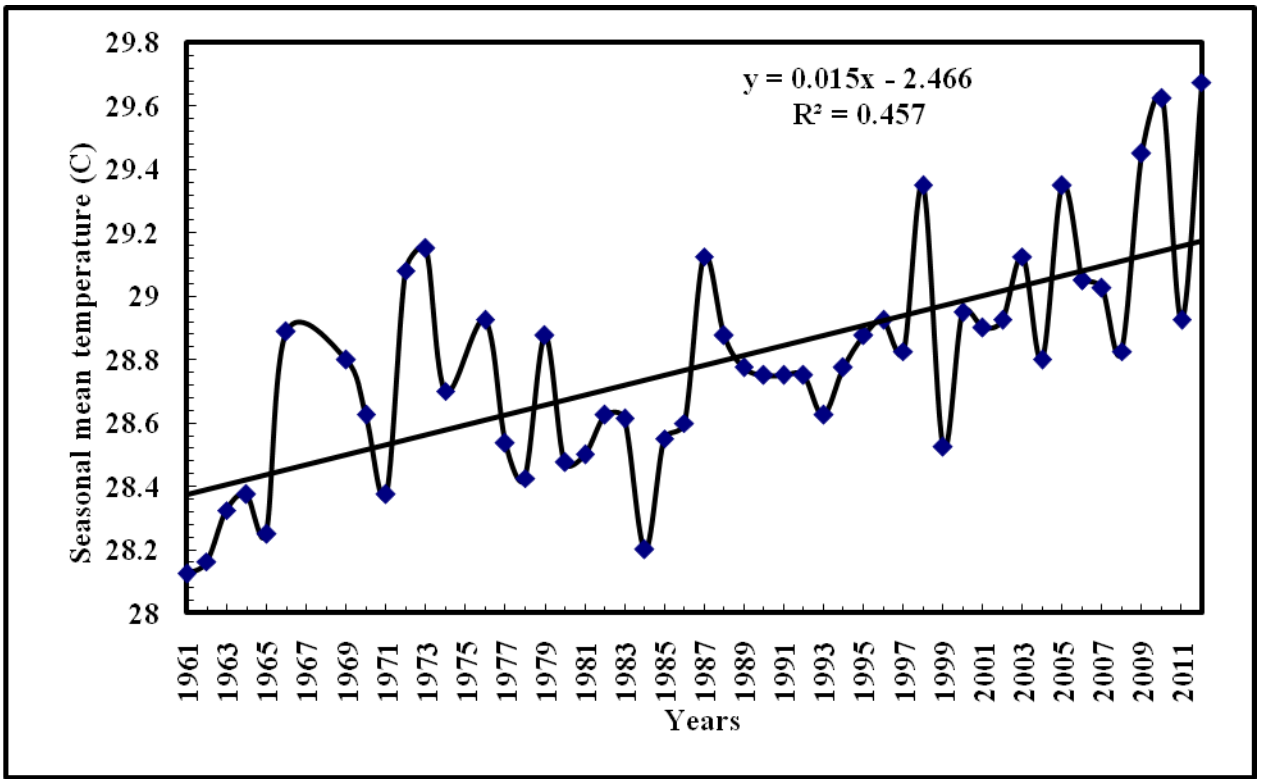

চিত্রঃ খুলনায় ১৯৬১-২০১২ সময়কালে বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

বর্ষা কালে খুলনায় তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

সাল	বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে বর্ষা কালে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	বর্ষা কালে তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./বছর)
১৯৬১	২৮.১৩		২৮.৭৮	+০.০১৫
১৯৮০	২৮.৪৮	+০.৩৫		
২০০০	২৮.৯৫	+০.৪৭		
২০১২	২৯.৬৮	+০.৭৩		

খুলনায় ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার প্রোজেকশন (ডিগ্রী সে.) ঃ

ঋতুর নাম	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
প্রাক বর্ষা ঋতু	২৮.১০	২৭.৮৬
বর্ষা ঋতু	২৭.৯৮	২৮.২৮

খুলনায় ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি/হ্রাস ঃ

খুলনায় বর্তমান গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা চলতে থাকলে গরম ও বর্ষা কালে ২০৫০ সালে তাপমাত্রা হ্রাস পাবে যথাক্রমে -০.৮৩.২৫ ও -০.৩৪ ডিগ্রী সে.। কিন্তু ২০৫০ সালের পরে বর্ষাকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং ২১৫০ সালে খুলনায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ১.১৬ ডিগ্রী সে.।

ঋতুর নাম	১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	২০৩০ সাল (ডিগ্রী সে.)	২০৫০ সাল (ডিগ্রী সে.)	২১০০ সাল (ডিগ্রী সে.)	২১৫০ সাল (ডিগ্রী সে.)
প্রাক বর্ষা ঋতু (গরম কাল)	২৮.৬৯	-০.৫৯	-০.৮৩	-১.৪৩	-২.০৪
বর্ষা ঋতু	২৮.৬২	-০.৬৪	-০.৩৪	+০.৪১	+১.১৬

খুলনায় ১৯৬১-২০১২ সময়ে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা (Trend in annual total rainfall at Khulna) ঃ

চিত্র থেকে দেখা যায়, খুলনায় ১৯৬১-২০১২ সময়ে কালে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ পরিবর্তনের প্রবণতার হার হচ্ছে প্রতি বছরে +৫.৫১৪৯ মি.মি. ।

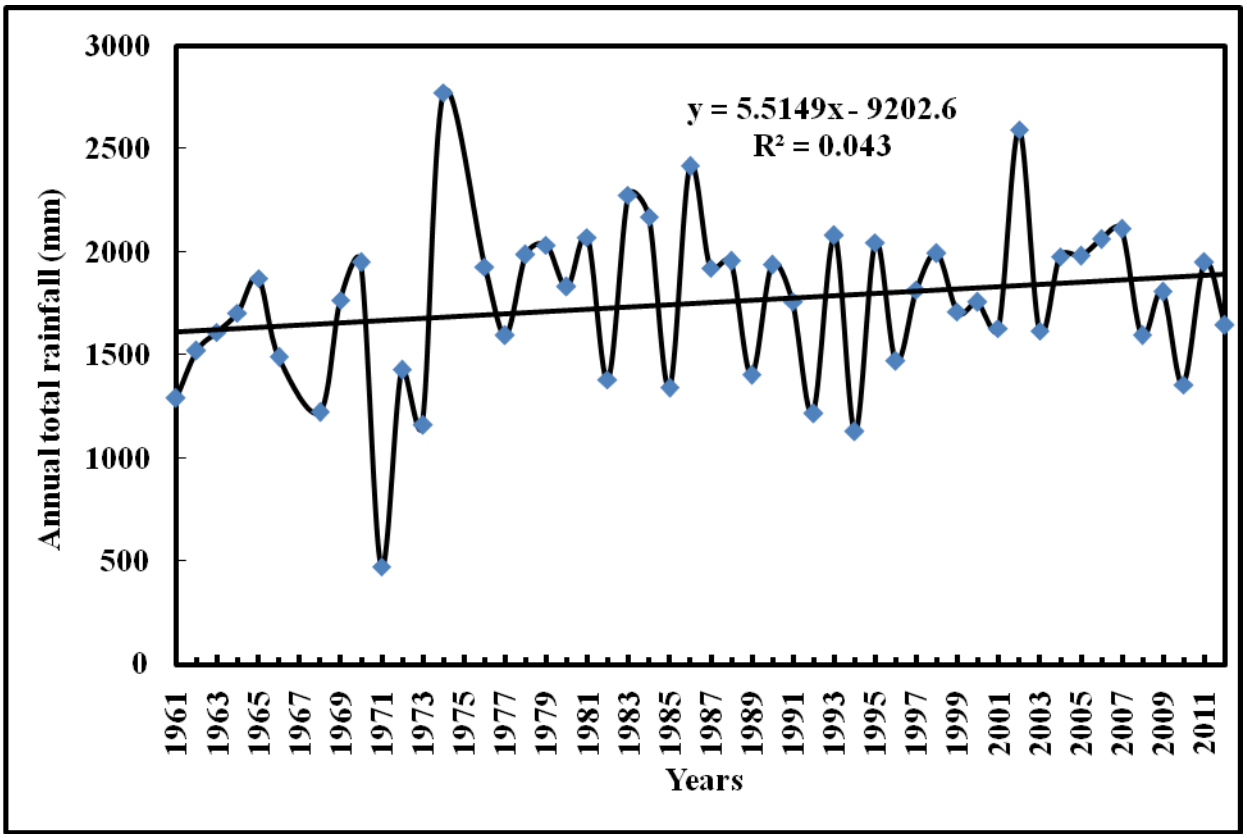

চিত্রঃ খুলনায় ১৯৬১-২০১২ সময় কালে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা
(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

খুলনায় বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬১	১২৯১		১৭৫৬.২৫	+৫.৫১৪৯
১৯৮০	১৮৩০	+৫৩৯		
২০০০	১৭৫৬	-৭৪		
২০১২	১৬৪৫	-১১১		

খুলনায় বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রোজেকশন (মি.মি.) ঃ

খুলনায় বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের বর্তমান প্রবণতার হার চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত হবে ২১০১.৭০ মি.মি. যা বনজ সম্পদের জন্য ক্ষতিকর করবে।

২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
১৯৯২.৬৫	২১০২.৯৫

খুলনায় ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রবণতা (মি.মি.) [Trends in seasonal total rainfall (mm) at Khulna] ঃ

খুলনায় গরমকালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা হ্রাসের দিকে এবং এ হ্রাসের হার প্রতি বছরে -০.৩৮১ মি.মি.।

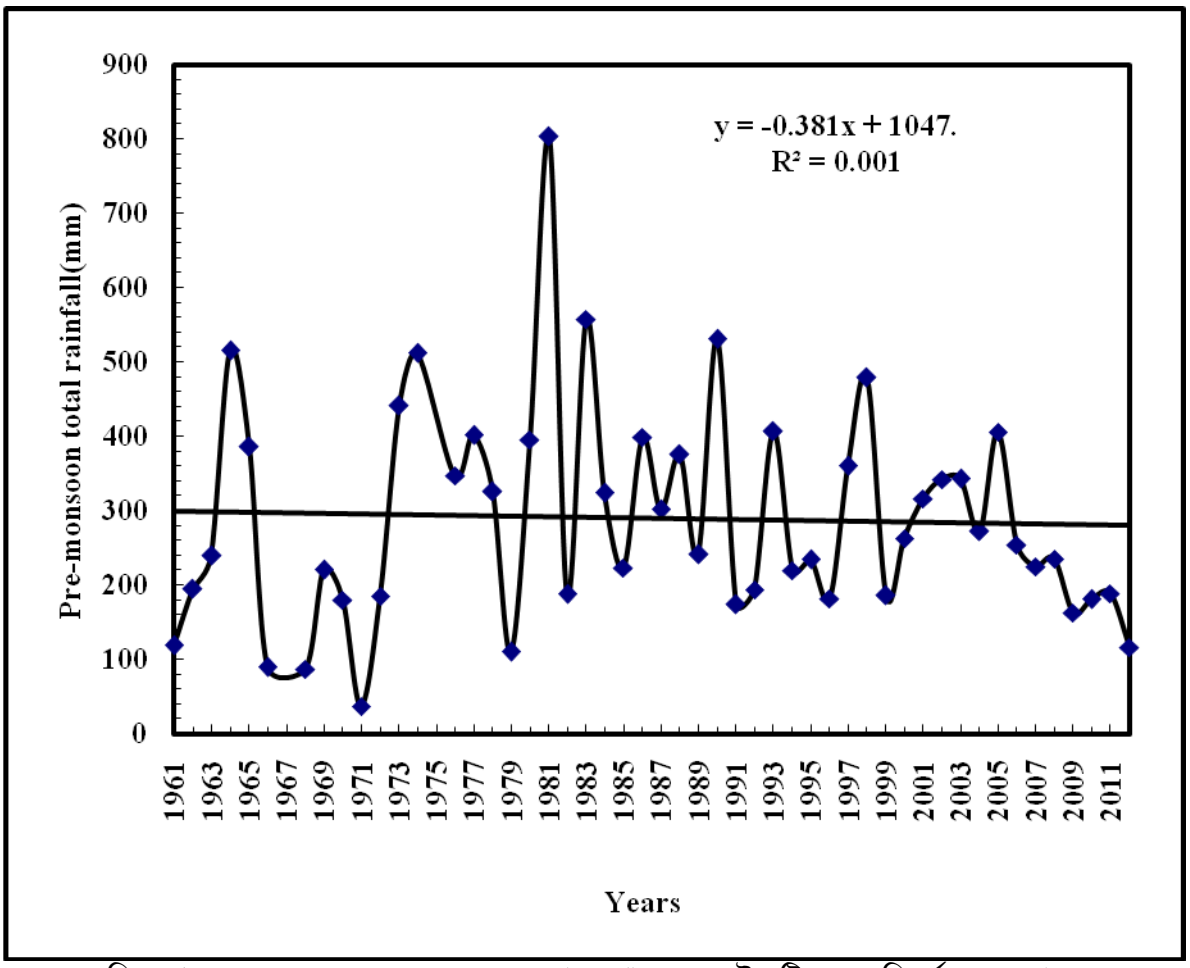

চিত্রঃ খুলনায় ১৯৬১-২০১২ সময় কালে গরম ঋতুতে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

গরম কালে খুলনায় মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	গরম কালে মোট বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে গরম কালে মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	গরম কালে গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	গরম কালে মোট বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬০	১১৯.০০		২৮৯.৫১	-০.৩৮১
১৯৮০	৩৯৬.০০	+২৭৭		
২০০০	২৬৩.০০	-১৩৩		
২০১২	১১৬.০০	-১৪৭		

খুলনায় ১৯৬১-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা ঃ

খুলনায় ১৯৬১-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ বৃদ্ধির হার প্রতি বছরে +৩.৮৩৬ মি.মি. ।

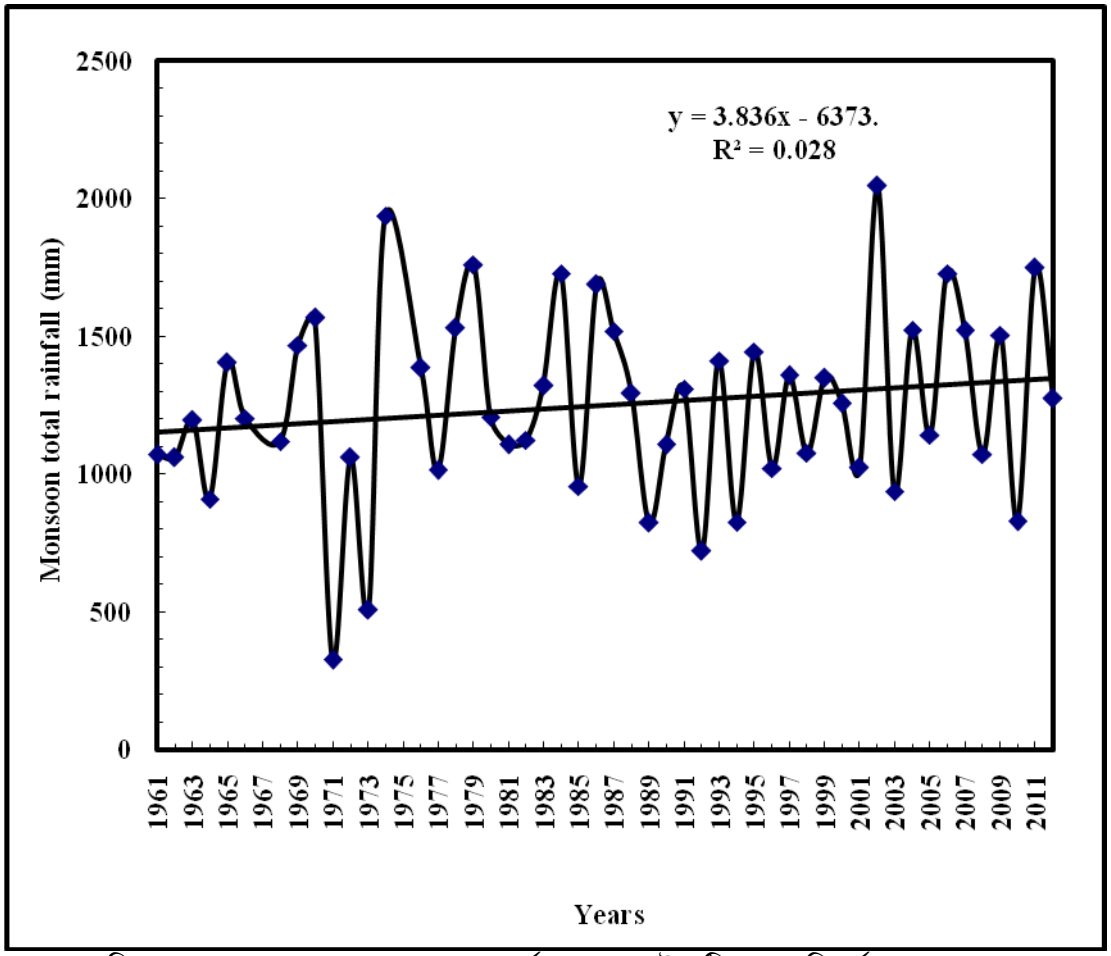

চিত্রঃ খুলনায় ১৯৬১-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

বর্ষাকালে খুলনায় মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	বর্ষা বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	বর্ষা কালে গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬০	১০৭১		১২৫০.৭২	+৩.৮৩৬
১৯৮০	১২০৬	+১৩৫		
২০০০	১২৫৭	+৫১		
২০১২	১২৭৪	+১৭		

খুলনায় ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রোজেকশন (মি.মি.) ঃ

ঋতুর নাম	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
প্রাক বর্ষা ঋতু	২৭৩.০৫	২৬৫.৪২
বর্ষা ঋতু	১৪১৪.৭০	১৪৯১.৪৩

খুলনায় ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাতের তুলনায় ভবিষ্যতে ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের হ্রাস/বৃদ্ধি (মি. মি.) ঃ

খুলনায় বর্তমান বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের ধারা চলতে থাকলে, ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাতের তুলনায় ২০৫০ সালে গরম ও বর্ষাকালে বৃষ্টি যথাক্রমে কম ও বেশী হবে এবং এর পরিমান হবে যথাক্রমে -৪৬.৫৩ মি.মি. ও ২৬৩.১৯ মি.মি.। ফলে গরমকালে খুলনায় খরা হবার সম্ভাবনা দেখা দিবে এবং বর্ষাকালে বন ও ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

ঋতুর নাম	১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	২০৩০ সাল (মি.মি.)	২০৫০ সাল (মি.মি.)
প্রাক বর্ষা ঋতু (গরম কাল)	৩১১.৯৪	-৩৮.৮৯	-৪৬.৫৩
বর্ষা ঋতু	১২২৮.২৪	১৮৬.৪৬	২৬৩.১৯

সিলেট অঞ্চল ঃ

সিলেটে ১৯৬১-২০১২ সময়ে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা ঃ

নীচের চিত্র হতে দেখা যায়, সিলেটে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা বৃদ্ধির দিকে এবং এর হার প্রতি বছরে +০.০১১ ডিগ্রী সে. ।

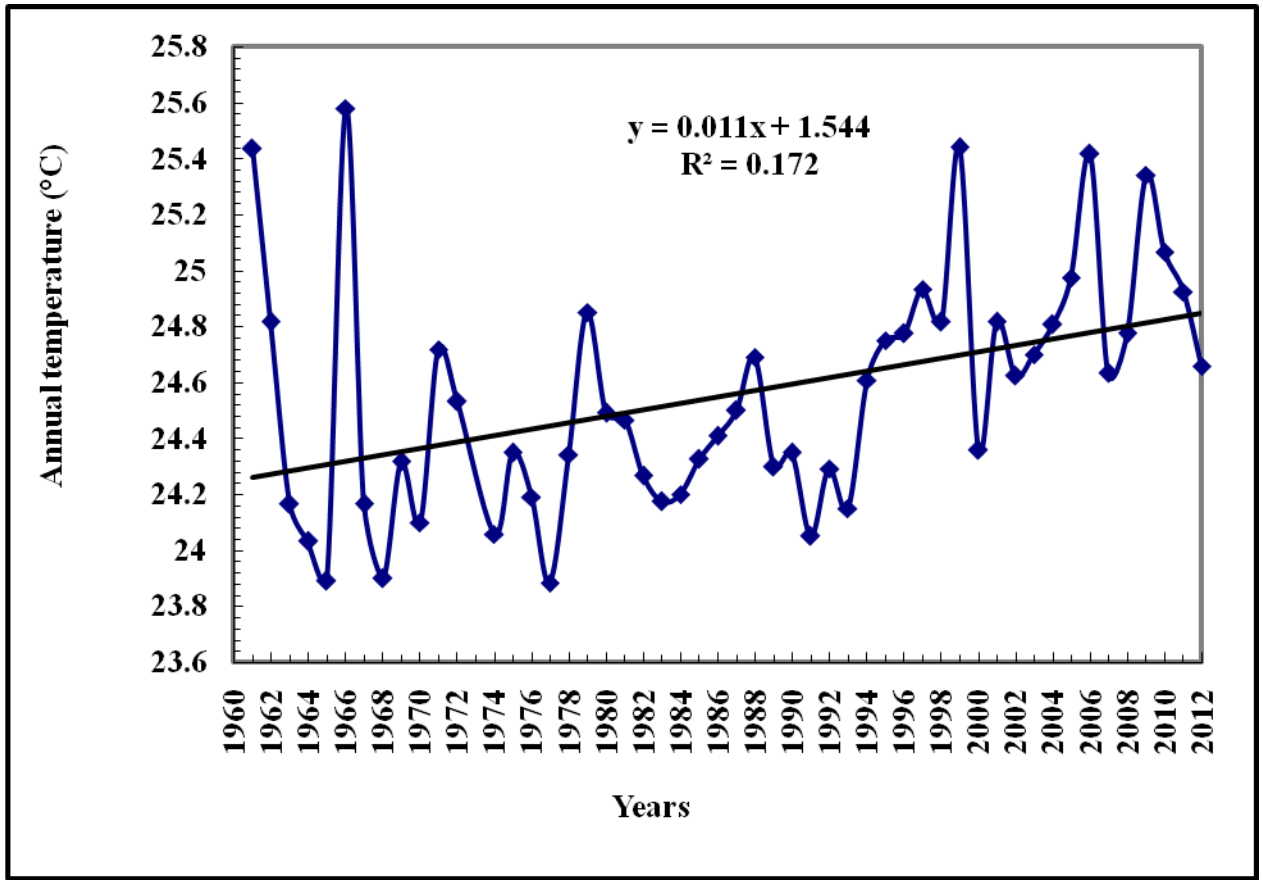

চিত্রঃ সিলেটে ১৯৬১-২০১২ সময়কালে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা

সিলেটে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার অবস্থাঃ

সাল	গড় বার্ষিক তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	গড় বার্ষিক তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	বার্ষিক তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./ বছর)
১৯৬১	২৫.৪৪		২৪.৫৬	+০.০১১
১৯৮০	২৪.৪৯	-০.৯৫		
২০০০	২৪.৩৬	-.১৩		
২০১২	২৪.৬৬	+.৩০		

সিলেটে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার প্রোজেকশন (ডিগ্রী সে.) ঃ

২০৩০ ও ২০৫০ সালে সিলেটে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা হবে যথাক্রমে ২৫.০৯ ডিগ্রী সে. ও ২৫.৩২ ডিগ্রী সে.।

২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
২৫.০৯ ডিগ্রী সে.	২৫.৩২ ডিগ্রী সে.

সিলেটে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঃ

নিম্নের সারণীতে **১৯৬১-১৯৯০** সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ২০৩০ ও ২০৫০ সালে কত হবে তা দেয়া হলো। সিলেটে তাপমাত্রার পরিবর্তনের বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ তাপমাত্রার বৃদ্ধি পাবে ০.৮২ ডিগ্রী সে.।

১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
২৪.৪৬ ডিগ্রী সে.	+০.৬৩ডিগ্রী সে.	+০.৮৬ ডিগ্রী সে.

সিলেটে ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (Trends in seasonal temperatures) ঃ

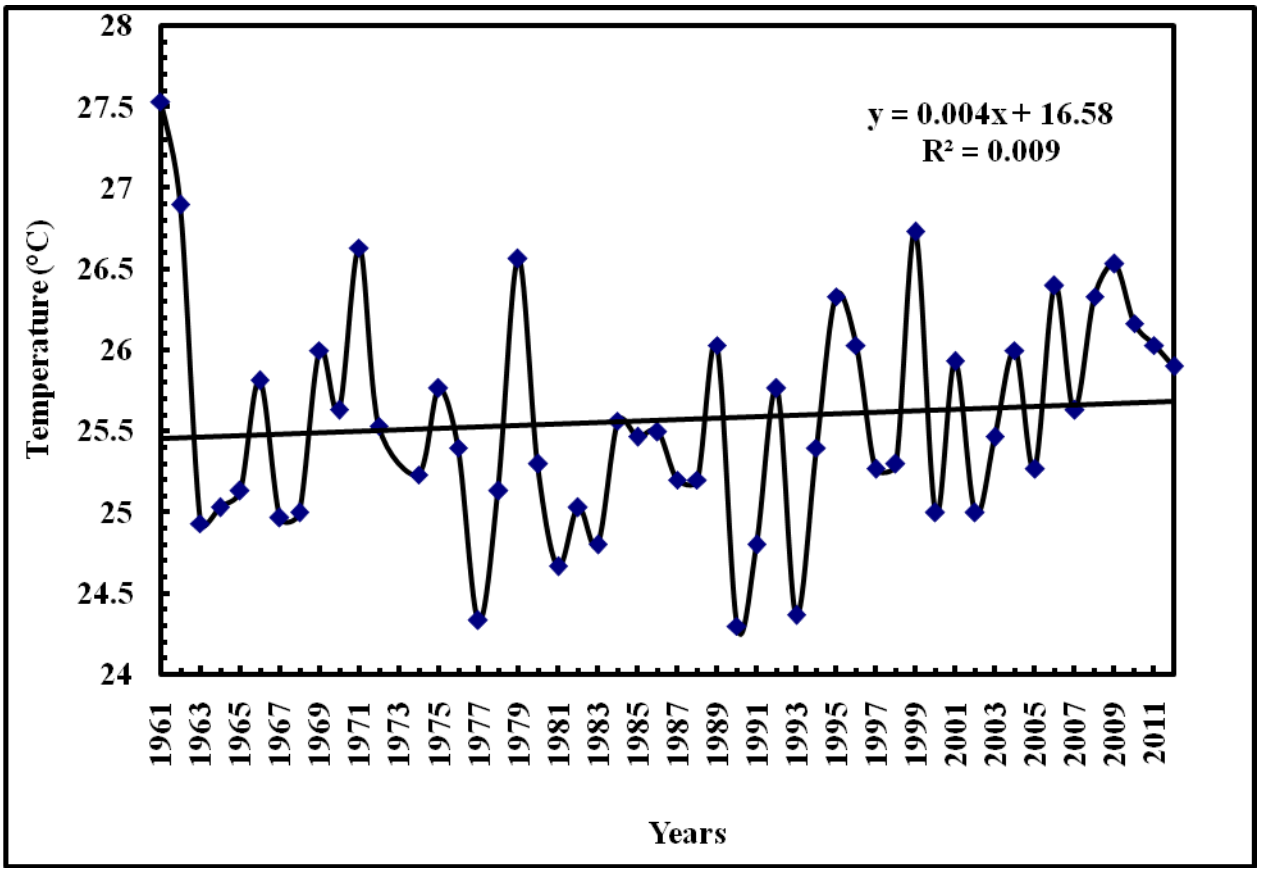

চিত্রঃ সিলেটে ১৯৬১-২০১২ সময়কালে গরম কালে গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

গরম কালে সিলেটে তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

নীচের সারণী গরম কালে সিলেটে তাপমাত্রার পরিবর্তনে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৬১-২০১২ সময়কালে তাপমাত্রার বৃদ্ধির হার +০.০০৪ ডিগ্রী সে. (নীচের সারণী)।

সাল	গরম কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে গরম কালে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	গরম কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	গরম কালে তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./বছর)
১৯৬১	২৭.৫৩		২৫.৫৭	+০.০০৪
১৯৮০	২৫.৩০	-২.২৩		
২০০০	২৫.০০	-০.৩০		
২০১২	২৫.৯	+০.৯০		

বর্ষা কালে সিলেটে তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

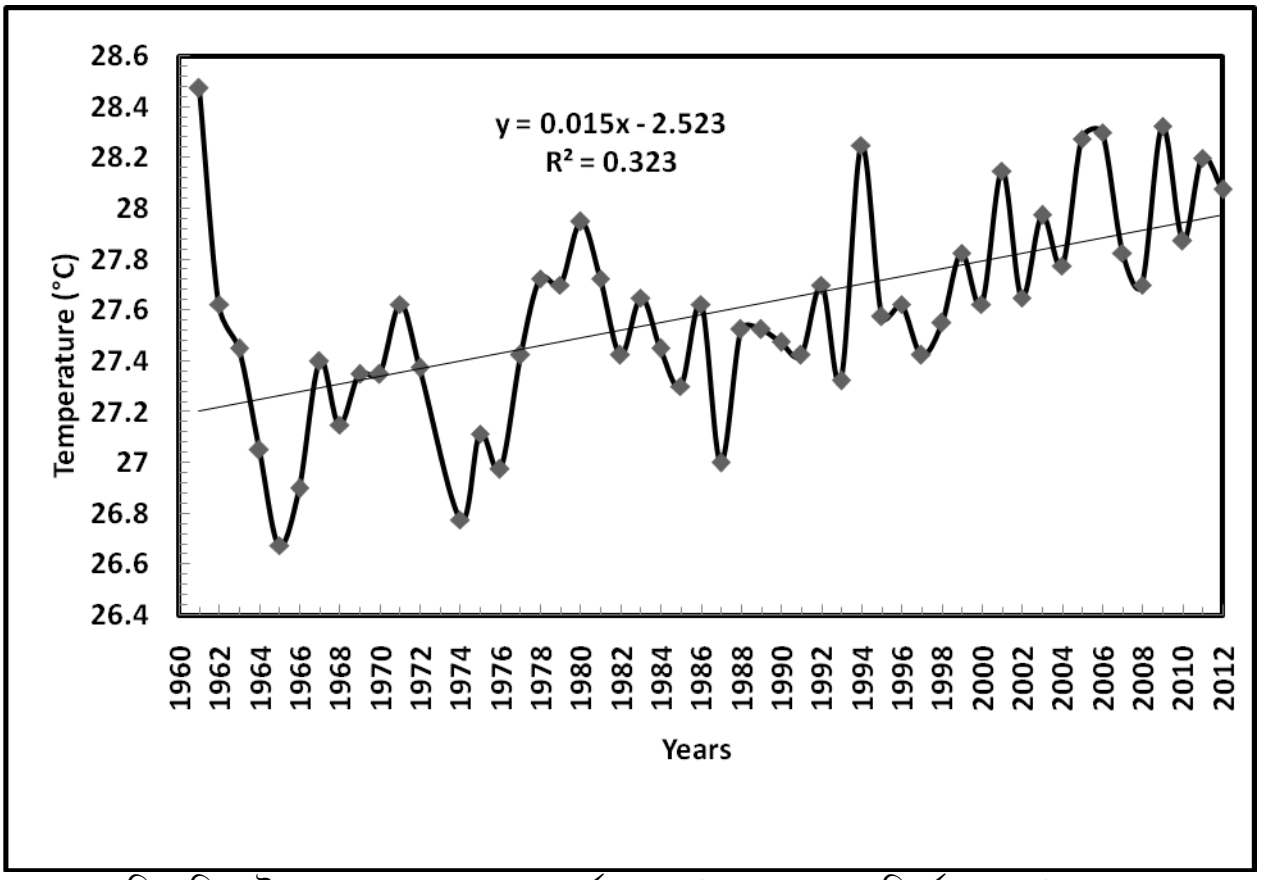

চিত্রঃ সিলেটে ১৯৬১-২০১২ সময়কালে বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

বর্ষা কালে সিলেটে তাপমাত্রার অবস্থা ঃ

সাল	বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	প্রতি ২০ বছরে বর্ষা কালে তাপমাত্রার তারতম্য (ডিগ্রী সে.)	বর্ষা কালে গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	বর্ষা কালে তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (ডিগ্রী সে./বছর)
১৯৬১	২৮.৪৮		২৭.৫৯	+০.০১৫
১৯৮০	২৭.৯৫	-০.৫৩		
২০০০	২৭.৬৩	-০.৩০		
২০১২	২৮.০৮	+০.৬৩		

সিলেটে ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার প্রোজেকশন (ডিগ্রী সে.) ঃ

ঋতুর নাম	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
প্রাক বর্ষা ঋতু/গরমকাল	২৫.৭২	২৫.৮১
বর্ষা ঋতু	২৮.৩৩	২৮.৬৪

সিলেটে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভবিষ্যতে ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঃ

সিলেটে বর্তমান গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা চলতে থাকলে গরম ও বর্ষা কালে ২০৫০ সালে সিলেটে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে যথাক্রমে ০.৩২ ও ১.১৩ ডিগ্রী সে. ।

ঋতুর নাম	১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সে.)	২০৩০ সাল (ডিগ্রী সে.)	২০৫০ সাল (ডিগ্রী সে.)
প্রাক বর্ষা ঋতু (গরম কাল)	২৫.৪০	+০.৩২	+০.৪১
বর্ষা ঋতু	২৭.৫১	+০.৮২	+১.১৩

সিলেটে ১৯৫৬-২০১২ সময়ে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা (Trend in annual total rainfall at Sylhet) ঃ

চিত্র থেকে দেখা যায়, সিলেটে ১৯৫৬-২০১২ সময়ে কালে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ পরিবর্তনের প্রবণতার হার হচ্ছে প্রতি বছরে +৩.৩৩৩ মি.মি.

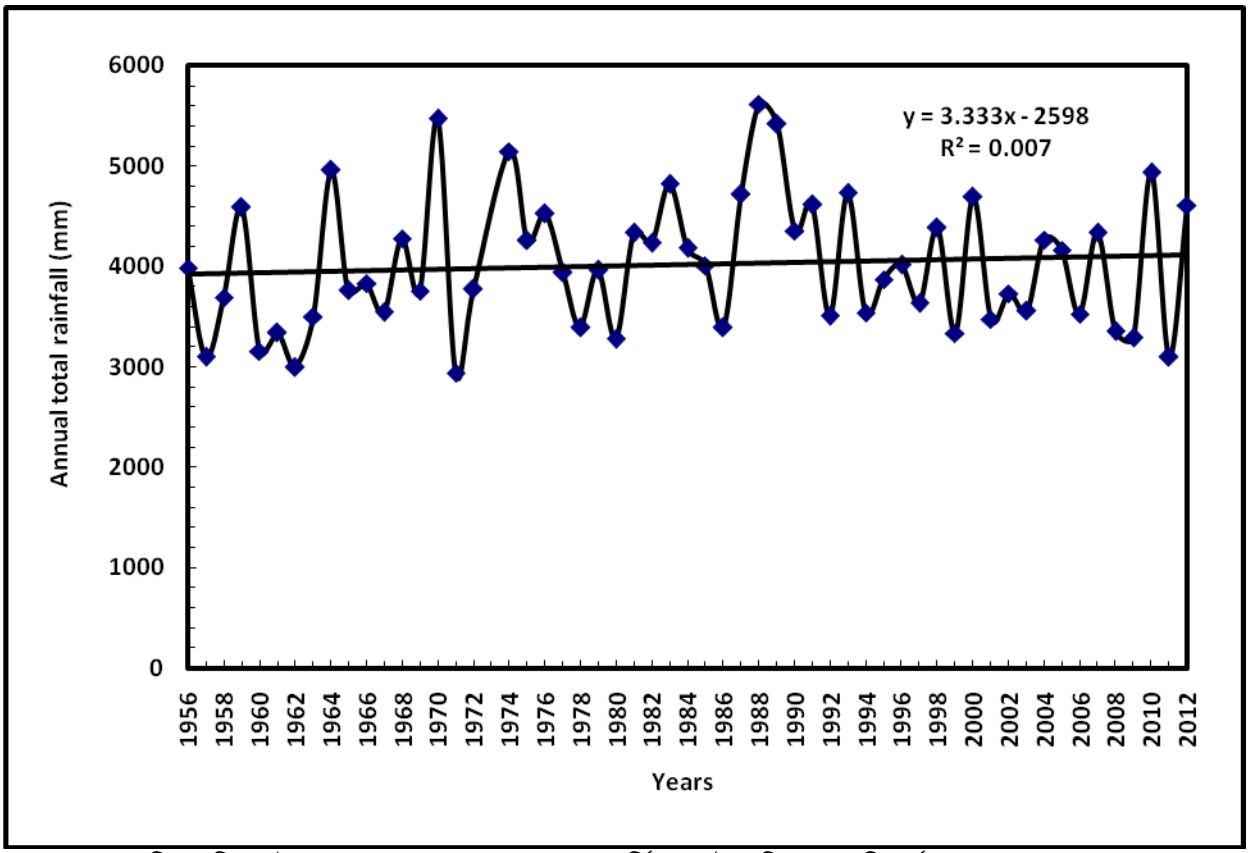

চিত্রঃ সিলেটে ১৯৫৬-২০১২ সময় কালে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্য সূত্র:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

সিলেটে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬০	৩১৫৮		৪০১৭.১৭	+৩.৩৩৩
১৯৮০	৩২৮০	+১২২		
২০০০	৪২৯৬	+১০১৬		
২০১২	৪৬১০	+৩১৪		

সিলেটে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রোজেকশন (মি.মি.) ঃ

সিলেটে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের বর্তমান প্রবণতার হার চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ সিলেটে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত হবে ৪১৮৬.৪৯ মি.মি. যা ভূমিধ্বস বাড়াবে ও বনজ সম্পদের জন্য ক্ষতিকর হবে।

২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
৪১৬৯.৮২ মি.মি.	৪১৮৬.৪৯ মি.মি.

সিলেটে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি ঃ

নিম্নের সারণীতে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় ভবিষ্যতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি ২০৩০ ও ২০৫০ সালে কত হবে তা দেয়া হলো। সিলেটে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি পাবে ৫৬.৬৯ মি.মি.।

১৯৬১-১৯৯০ সময়ের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
৪১২৯.৮০ মি.মি.	+৪০.০২মি.মি.	+ ৫৬.৬৯ মি.মি.

সিলেটে ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রবণতা (মি.মি./বছর) [Trends in seasonal total rainfall (mm) at Sylhet] ঃ

সিলেটে গরমকালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা বৃদ্ধির দিকে এবং এ বৃদ্ধি হার প্রতি বছরে ৩.৮৭৪ মি.মি.।

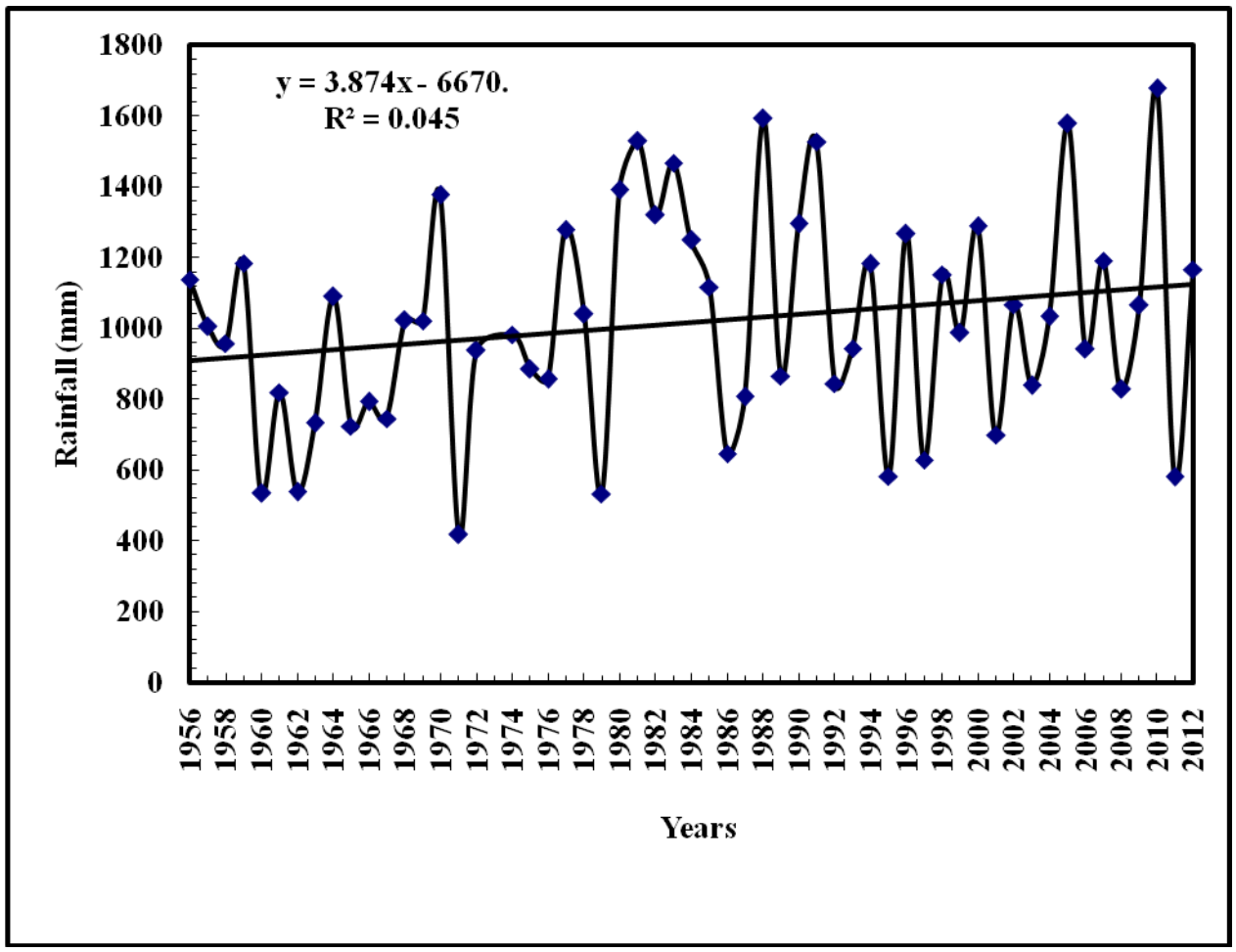

চিত্রঃ সিলেটে ১৯৫৬-২০১২ সময়ে গরমকালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

গরম কালে সিলেটে মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	গরম কালে মোট বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে গরম কালে মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	গরম কালে গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	গরম কালে মোট বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬০	৫৩৫		১০১৭.৫৬	+৩.৮৭৪
১৯৮০	১৩৯১	+৮৫৬		
২০০০	১২৮৯	-১০২		
২০১২	১১৬৬	-১২৩		

সিলেটে ১৯৫৬-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা ঃ

সিলেটে ১৯৫৬-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত কমে যাবার লক্ষণ দেখা যায় এবং এ হ্রাসের হার প্রতি বছরে -০.১৭৯ মি.মি. ।

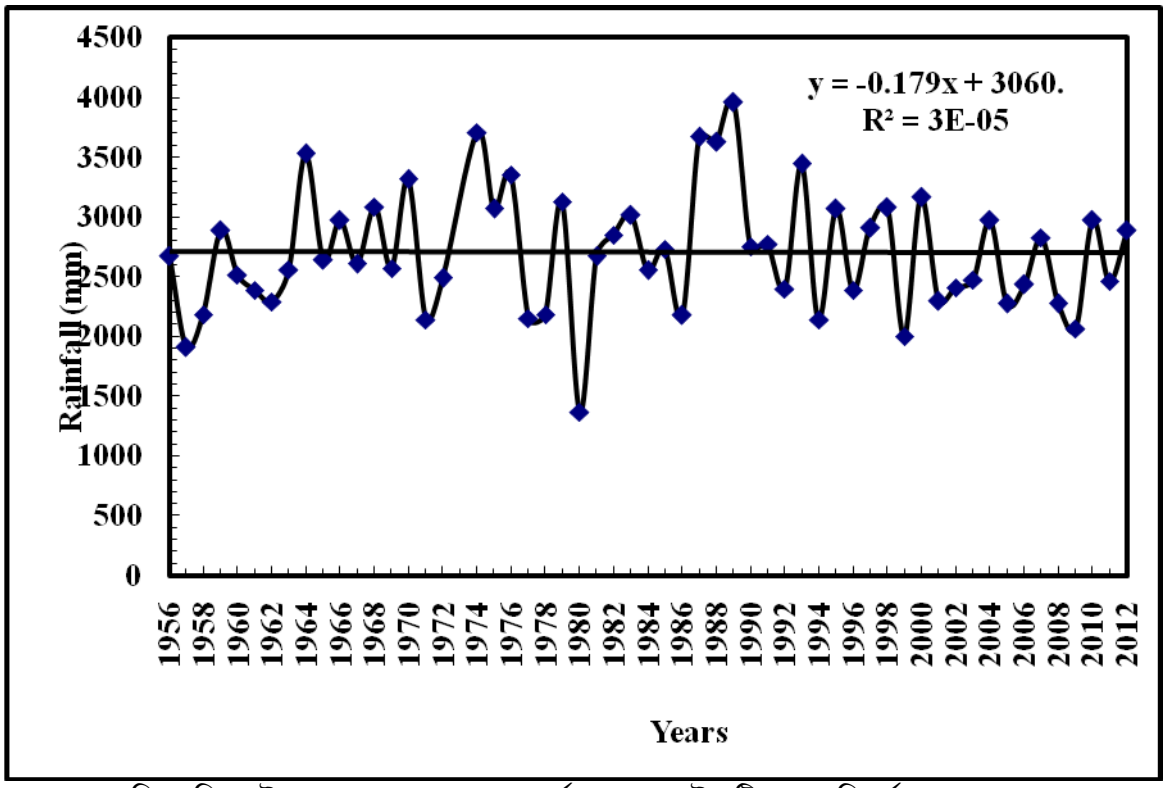

চিত্রঃ সিলেটে ১৯৫৬-২০১২ সময়ে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের প্রবণতা

(তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

বর্ষাকালে সিলেটে মোট বৃষ্টিপাতের অবস্থা ঃ

সাল	বর্ষা বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	প্রতি ২০ বছরে বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাতের তারতম্য (মি.মি.)	বর্ষা কালে গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	বর্ষা কালে মোট বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের প্রবণতা (মি.মি./বছর)
১৯৬০	২৫১৫		২৭০৪.৩২	-০.১৭৯
১৯৮০	১৩৬৭	-১১৪৮		
২০০০	৩১৬৪	+১৭৯৭		
২০১২	২৮৮৪	-২৮০		

সিলেটে ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রোজেকশন (মি.মি.) ঃ

ঋতুর নাম	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
প্রাক বর্ষা ঋতু/গরমকাল	১১৯৫.০৪	১২৭২.৫৪
বর্ষা ঋতু	২৬৯৬.১২	২৬৯২.৫৪

সিলেটে ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাতের তুলনায় ভবিষ্যতে ঋতু ভিত্তিক মোট বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি (মি. মি.) ঃ

সিলেটে বর্তমান বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের ধারা চলতে থাকলে, ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাতের তুলনায় ২০৫০ সালে গরমকালে বেশী হবে ও বর্ষাকালে বৃষ্টি কম হবে যথাক্রমে ২১৬.৪৬ মি.মি. ও -৮৬.১৪ মি.মি.।

ঋতুর নাম	১৯৬১-১৯৯০ সময়ের ঋতু ভিত্তিক গড় মোট বৃষ্টিপাত	২০৩০ সাল	২০৫০ সাল
প্রাক বর্ষা ঋতু (গরম কাল)	১০৫৬.০৮	+১৩৮.৯৬	+২১৬.৪৬
বর্ষা ঋতু	২৭৭৮.৬৭	-৮২.৫৫	-৮৬.১৪

সাম্প্রতিক বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধির ধারা ঃ

- বিশ্বের প্রত্যেক দেশের জলবায়ু আজ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে
- উষ্ণায়ন বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ওজোন স্তরের তারতম্যের ফলে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আজ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গী হয়েছে
- শান্তিতে নোবেল বিজয়ী (২০০৭) সংস্থা জাতিসংঘের আইপিসিসিসির তথ্যমতে, গত শতাব্দীতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৭° সে. বৃদ্ধি পেয়েছে
- ২০২০ সালে এ তাপমাত্রা আরও ০.৬৫° সে. বাড়বে
- পরবর্তীতে ২০৫০ সালে এ তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়াবে ১.৮° সে এবং ২১০০ সালে এর পরিমান হবে ২.৪° সে
- প্রতিবেদনটিতে দেখা যায়, ২০৩০ সাল নাগাদ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত বাড়বে ৫ শতাংশ এবং ২১০০ সালে এ বৃদ্ধির হার গিয়ে দাঁড়াবে ১০ শতাংশে
- গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির তুলনায় শীতকালে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার হবে বেশি
- অন্যদিকে শীতের তীব্রতা অনেকটাই কমে যাবে এবং গরমের মাত্রা ও ক্রমশ বাড়বে।

অধিবেশন ৩

শিরোনাম ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে বন ও জলাভূমি এবং সহ-ব্যবস্থাপনাপনার ভূমিকা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবণতা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বনের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে সহ-ব্যবস্থাপনার ভূমিকা বিষয়ে জানতে পারবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১.	বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	কাগজ ও কলম, ফ্লিপশীট ও মার্কার	২০ মিনিট
২.	জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বনের ভূমিকা	দৃশ্যমান উপস্থাপনা, ঝড়ো ভাবনা	পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপশীট ও মার্কার	১০ মিনিট
৩.	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বনের ভূমিকা	ঝড়ো ভাবনা, দলীয় কাজ ও দৃশ্যমান উপস্থাপনা	ফ্লিপশীট/পোস্টার ও মার্কার	১০ মিনিট
৪.	সহ-ব্যবস্থাপনা	মুক্ত আলোচনা	তথ্যপত্র	২০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন

- এ অধিবেশনটি ছোট ছোট প্রশ্ন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো হতে পারে-
    - ✓ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কি বুঝি?
    - ✓ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবণতা সমূহ কি কি?
- প্রয়োজনে সংযোজনীর সহায়তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বনের ভূমিকা

- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করা যেতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসের জন্য বনের কেন প্রয়োজন হয়? তাঁদের উত্তরগুলো শুনে ফিপ্লা শীটে লিখে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- এ পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বনের ভূমিকার ওপর তৈরিকৃত পোস্টার বোর্ডে বা দেয়ালে ঝুলিয়ে/মাল্টিমিডিয়াতে প্রদর্শন করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বনের ভূমিকা

- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বনের ভূমিকা বিষয়টি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে। আলোচনায় হ্যান্ডআউট/সংযোজনীর সহায়তা নিতে পারেন।
- এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বনের ভূমিকা গুলো কি হবে তার ওপর দলীয় কাজ দেয়া যেতে পারে।
- দলীয় কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করানো যেতে পারে। উপস্থাপনের সময় কোন সংযোজন ও বিয়োজন থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- এবার, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বনের ভূমিকা গুলো কি কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সহ-ব্যবস্থাপনা

- এই পর্যায়ে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সংগঠন এর গঠন ও কার্যাবলী বিষয়ে সংযোজনীর সহায়তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

- সবশেষে আলোচনার সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার এরূপ দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম সারিতে রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়োঃনিষ্কাশন (Water & Sanitation) এবং জীববৈচিত্র্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, সমুদ্র পৃষ্ঠের তুলনায় স্বল্প উচ্চতায় অবস্থিত, অধিক জনসংখ্যা, দুর্বল অবকাঠামো, স্বল্প আয়, প্রকৌশলগত অনগ্রসরতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বেশী নির্ভরশীলতার কারণে এ দেশের ৭ কোটি লোক জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উপকূলীয় অঞ্চলের লোকজন বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে বাংলাদেশের ১০-১৫% এলাকা পানির নীচে তলিয়ে যাবে এবং এতে ৩.৫ কোটি লোক উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ সরকারের জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ প্রচেষ্টার মত অন্যান্য লক্ষ্যগুলি পূরণেও বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্ব ব্যাংক ধারণা করে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশকে দেয় বিদেশী উন্নয়ন সহায়তার ৪০% বাঁধাগ্রস্ত হবে।

২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা বাড়বে ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ২০৫০ সালে সেটা বেঁড়ে দাঁড়াবে ১.৪° সেন্টিগ্রেডে এবং ২১০০ সালে গিয়ে ওই তাপমাত্রাই কম করে হলেও ২.৪° সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পাবে । এছাড়া শীতকালে শীত কমে বাড়বে গরম আর গ্রীষ্মকালে মৌসুম লম্বা হয়ে উষ্ণতা হবে অনেক। বর্তমানে ছয় ঋতুর বাংলাদেশে শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তকাল তেমন অনুভব/লক্ষ্য করা যায় না।

বিরক্তিকর আবহাওয়া (বিশেষ করে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার ক্ষেত্রে), দীর্ঘ খরা, ঘন ঘন এবং অসময়ে ঝড়-ঝঞ্জা (সীডর, আইলা ইত্যাদি) ও বন্যার কারণে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা ধারণা করা হচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে তাপমাত্রার ক্ষেত্রে আরও পরিবর্তন আসবে এবং বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরণ পাল্টাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম বিশ্বের বেশির ভাগ গবেষণা সংস্থার তালিকায় অনেক আগেই উঠেছে। সারা বিশ্বে বিভিন্ন প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে, আগামী শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে আবহাওয়ার যতগুলো নেতিবাচক রূপ রয়েছে, তার প্রায় সবগুলোর প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়বে। বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো সবচেয়ে বেশি আঘাত হানবে যেসব দেশে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

বন্যা এলাকা বাড়বে ২৯ শতাংশ ঃ বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যে, প্রতি তিন থেকে পাঁচ বছর পর পর বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ এলাকা বন্যায় ডুবে যাবে। এতে ফসলের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি গরিব মানুষের ঘরবাড়ি বিনষ্ট হবে। তাপমাত্রা আড়াই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে বন্যায় প্লাবিত এলাকার পরিমাণ ২৯ শতাংশ বাড়বে। বন্যার সময় আগের চেয়ে বেশি উচ্চতা নিয়ে পানি প্রবাহিত হবে। এতে প্রধান ফসল বোরো ও আমনের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর কোনো

দূর ভবিষ্যতের বিষয় নয়। এর প্রভাব ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। দেশের উপকূলীয় এলাকায় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আগের চেয়ে ঘন ঘন আঘাত হানবে। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে বাংলাদেশের ৩৪ লাখ ৫০ হাজার মানুষের ঘরবাড়ি ডুবে যায়। ওই ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা। ২০৫০ সালের মধ্যে এ ধরণের ঘূর্ণিঝড় আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে তিন মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস নিয়ে উপকূলে আঘাত হানবে। এতে ৯০ লাখ মানুষের বাড়িঘর ডুবে যেতে পারে।

উপকূলের ৪০ শতাংশ ফসলি জমি হারিয়ে যাবে ঃ ২০৮০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৬৫ সেন্টিমিটার বাড়লে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৪০ শতাংশ ফসলি জমি হারিয়ে যাবে। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরে ৮০ হাজার টন ধানের উৎপাদন কম হয়েছিল। এর আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার ২৬০ কোটি টাকা। উপকূলীয় এলাকায় ইতোমধ্যেই লবণাক্ততা বাড়ার কারণে দুই কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে উঠবে। এর ফলে ওই এলাকাগুলোতে বড় ধরণের বিপর্যয় দেখা দেবে।

বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার পূর্বাভাস সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তাপদাহের পরিমাণ বাড়বে। মৌসুমি বৃষ্টিপাত কমে আসবে। আবার অল্প সময়ে অনেক বৃষ্টি হবে। এতে দেশে ঘন ঘন খরা দেখা দেবে। ভূ-অভ্যন্তরের পানির স্তর আরও নিচে নেমে আসবে। দেশে প্রতি পাঁচ বছর পর পর বড় ধরনের খরা হয়ে থাকে, এই তথ্য উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী দিনগুলোতে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খরার পরিমাণ বাড়বে। এতে বৃষ্টি নির্ভর ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ ধরনের খরা নিয়মিত হতে পারে। বন্যার কারণে ফসলের যে ক্ষতি হয়, খরায় তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হবে।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবণতা (Trends) ঃ

তাপমাত্রার পরিবর্তন ঃ

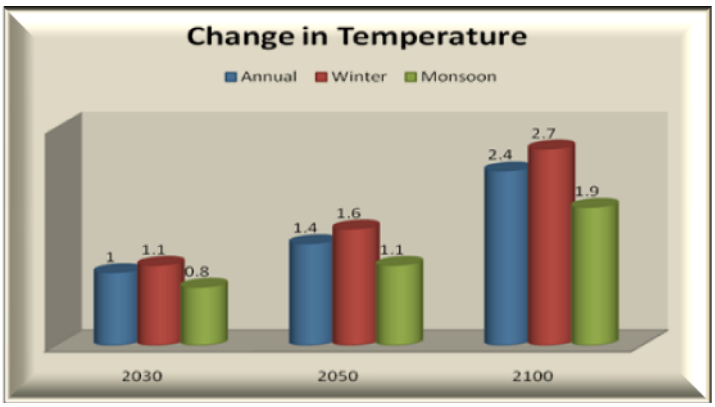

Source: Bangladesh NAPA Document

বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন ঃ

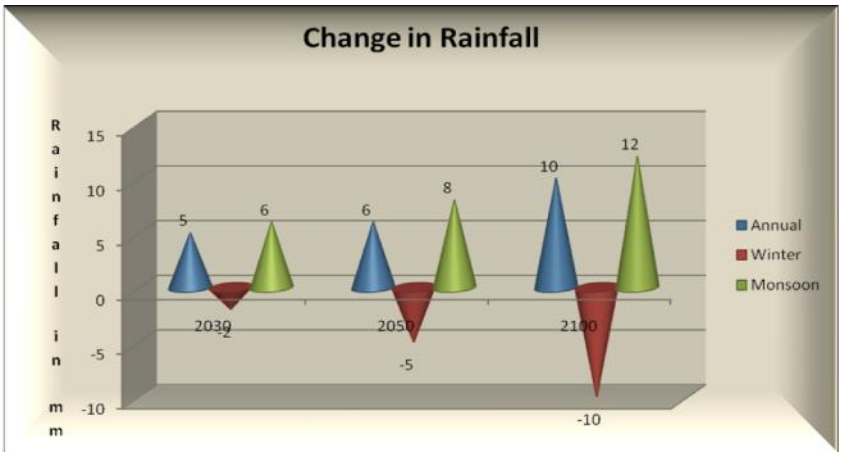

Source: Bangladesh NAPA Document

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (সে.মি.) ঃ

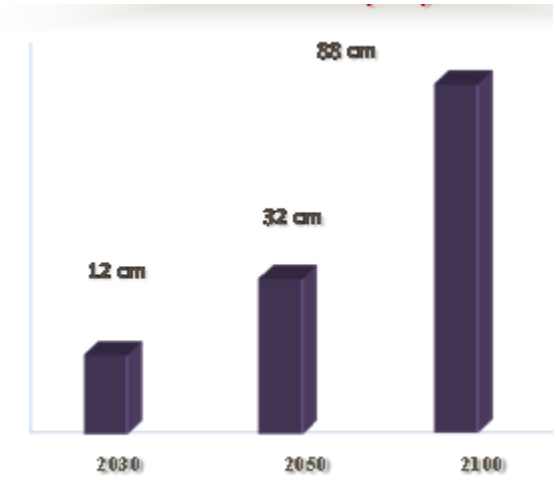

Source: Bangladesh NAPA Document

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (এক মিটার) ঃ

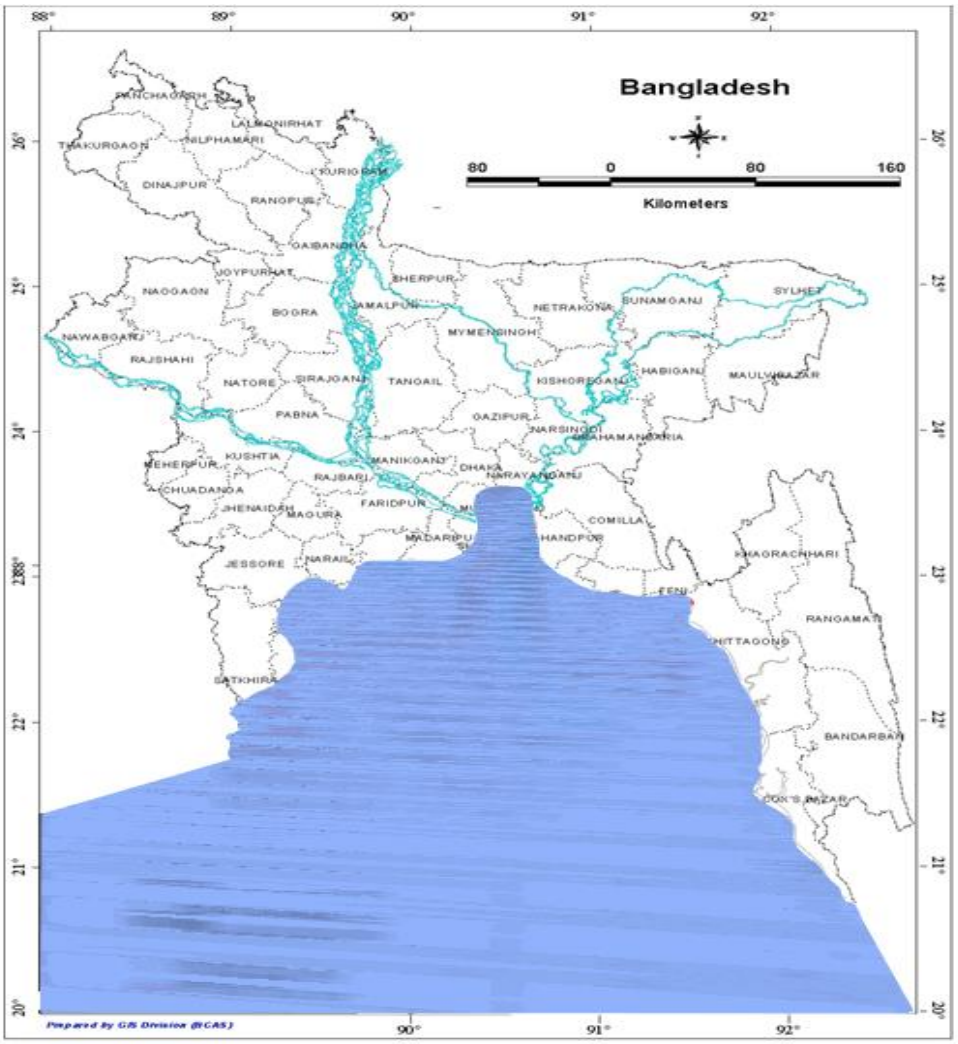

দুর্যোগের ধরণ (Patterns) ও তীব্রতার (Intensity) পরিবর্তন ঃ

বিশ্ব ব্যাপি জলবায়ু সংক্রান্ত দুর্যোগ দ্বিগুন হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘটিত দুর্যোগসমূহের মধ্যে ৯/১০টি দুর্যোগ বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রতি ৫-৭ বছরের মধ্যে বড় ধরনের বন্যা দেখা যাচ্ছে যা পূর্বে প্রতি ২০ বছরে দেখা যেত। যে সকল এলাকায় বৃষ্টিপাত কম হত সে সকল এলাকা বর্তমানে তীব্র অনাবৃষ্টি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত । সমুদ্রের উপরিভাগের উচ্চ তাপমাত্রার কারণে বাংলাদেশে আঘাত হানা সিডর ঝড় খুব শক্তিশালী ছিল ।

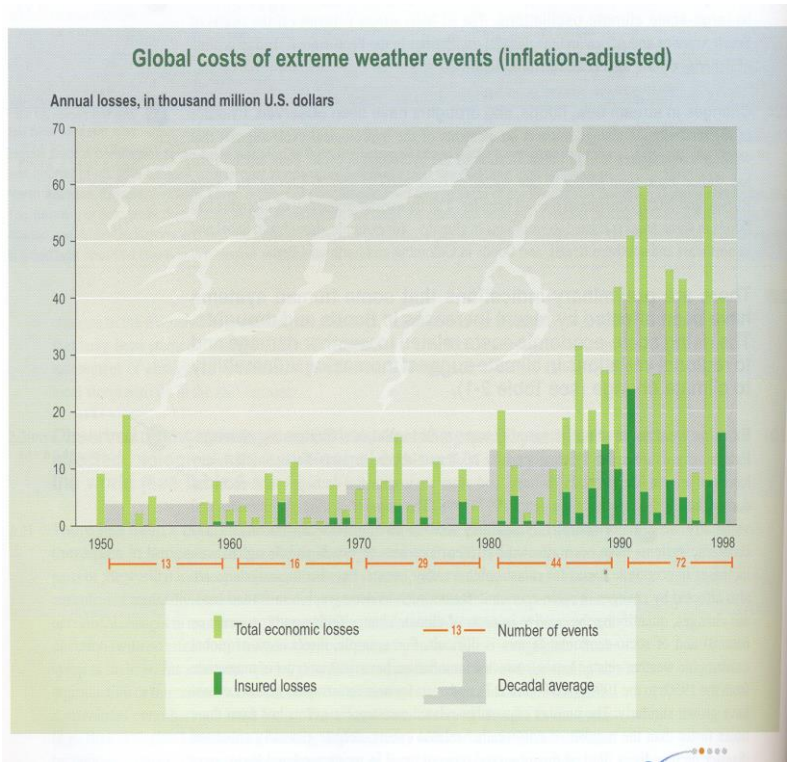

বাংলাদেশের বন্যা ঃ

বন্যা সংঘটনের হার (Frequency) ও তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৪, ২০০৭ সনে অনেক বড় ধরণের বন্যা হয়েছে। এছাড়া বন্যার ব্যাপ্তি (Coverage), তীব্রতা ও মেয়াদ (Duration) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আকস্মিক বন্যার (Flash Flood) সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে । এর ফলে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পানি ও স্বাস্থ্য, জীবিকায়ন, যাতায়াত ও সামাজিক নিরাপত্তার উপর প্রভাব পড়ছে । এছাড়া ২০০৭/২০০৮ সালে ব্যাপক হারে ডাইরিয়া রোগের প্রকোপ দেখা দেয়।

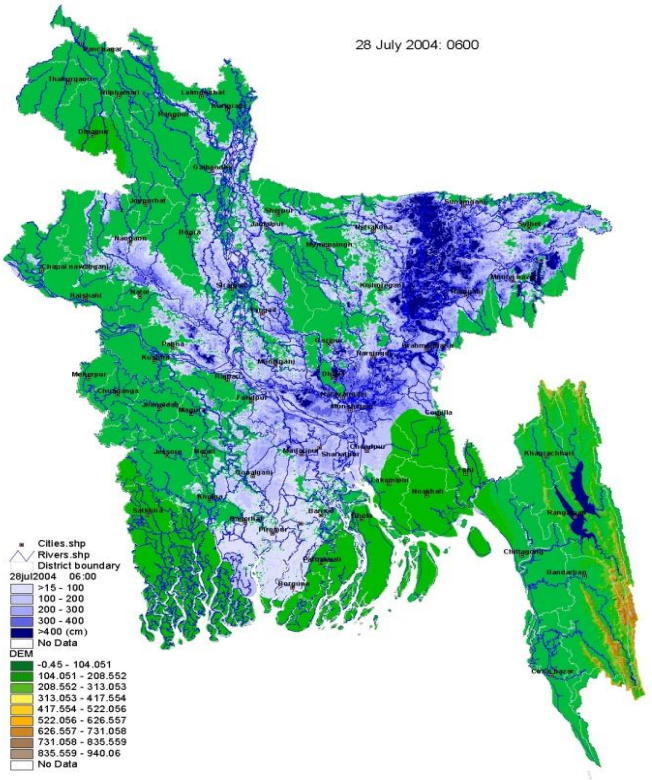

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডো ঃ

মানুষের জীবন, অবকাঠামো, সম্পদ, জলজ অর্থনীতি ও জীবিকায়নে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং টর্নেডোর প্রভাব অনেক। গত কয়েক দশকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা এবং সংঘটনের হার (Frequency) বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বড় ঘূর্ণিঝড় সংঘটনের বছরসমূহ হলোঃ ১৯৭০, ১৯৯১, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৪, ২০০৭ এবং ২০০৮। উল্লেখযোগ্য যে সিডর ও নার্গিস ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ছিল।

আরো উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায়, ১৯৯৬ সালে কালিহাতি, টাঙ্গাইলে এবং ২০১৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শক্তিশালী টর্নেডো হয়।

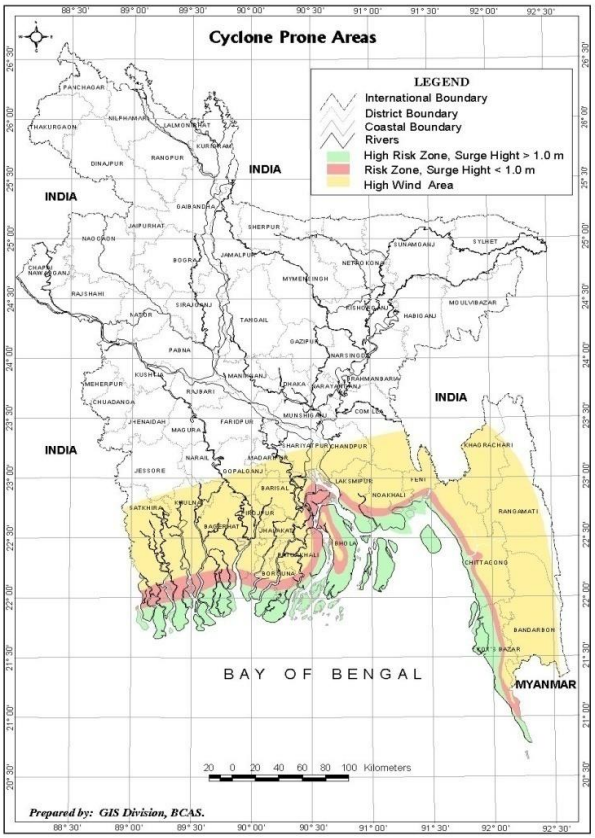

জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বনের ভূমিকা ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বন অসাধারণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বৈশ্বিক উষ্ণতা, কৃষির বিপর্যস্ততা ও খাদ্য নিরাপত্তার সংকটসহ নানাবিধ অভিঘাত (Impact) প্রশমনে বন নিম্নবর্ণিত ভূমিকা পালন করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ - সুন্দরবন না থাকলে সিডর ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি ও মৃতের সংখ্যা আরো অনেকগুন বেশী হতো।

(ক) তাপমাত্রা হ্রাসে বন ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম অভিঘাত হচ্ছে তাপমাত্রা। আর বনায়ন তাপমাত্রা হ্রাসের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে। বনের গাছপালা অসংখ্য ডাল ও পাতার ছাউনির সাহায্যে সূর্যের প্রখর আলো প্রতিহত করে মাটিকে ঠান্ডা রাখে। এজন্য বনে প্রবেশ করলেই এক ধরণের মোলায়েম বাতাস আঁচ করা যায়। গরমের দিনে দেখা যায় সাধারণতঃ বনের ভেতর ৮-৯° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা কম থাকে। গ্রীষ্মের দুপুরে একটা বড় আমগাছ বা মেহগনি গাছ কমপক্ষে ১০০ গ্যালন পানি বাতাসে পুনঃস্থাপন করে যা আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কৃত ১০টি এয়ারকুলারের পক্ষেও সম্ভব নয়। এছাড়া ৫০ থেকে ৫০০ মিটার পরিমাণ একটি সবুজ বনভূমি তদসংলগ্ন এলাকার ৩-৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা কমাবার ক্ষমতা রাখে।

(খ) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি জনিত বন্যা হ্রাসে বন ঃ

সমুদ্র উপকূলবর্তী বনের গাছপালা সমুদ্রতটের সন্নিহিত ভূভাগের ক্ষয় রোধে সহায়তা করে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকা হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। এসব এলাকায় পরিকল্পিতভাবে উপকূল উপযোগী গাছ লাগালে সহজেই তা ভূভাগে সমুদ্রের লোনা পানির প্রবেশকে প্রতিহত করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে উপকূলে জন্মানো গাছসমূহ যেমন - নারিকেল, হিজল, গাব, সুপারি, বায়েন, গর্জন, বট, চম্পা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

(গ) দারিদ্র্য হ্রাসে বন ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আজ বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবে চরম দারিদ্র দেখা দিয়েছে। একটি দেশ যদি প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করার উদ্যোগ নেয় তাহলে সহজেই দারিদ্রের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের পথে এগুতে পারবে। কারণ বনজ সম্পদের পরিকল্পিত ও বহুবিধ ব্যাবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব।

(ঘ) জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি প্রশমন ঃ

গত ৩৫ বছরে পূর্বে বিরাজমান জীববৈচিত্র্যের এক চতুর্থাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। আর এর পিছনে জলবায়ু পরিবর্তনও একটা অন্যতম কারণ। আজ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনে জীববৈচিত্র্য হুমকীর সম্মুখীন যা নিচের সারণী হতে ধারণা করা যায়।

প্রজাতি	বিপন্ন	বিপদাপন্ন	দুর্লভ	অনির্ণীত	মোট
স্তন্যপায়ী	১৭৭	১৯৯	৮৯	৬৮	৫৩৩
পাখি	১৮৮	২৪১	২৫৭	১৭৬	৮৬২
সরীসৃপ	৪৭	৮৮	৭৯	৪৩	২৫৭
উভচর	৩২	৩২	৫৫	১৪	১৩৩
মাছ	১৫৮	২২৬	২৪৬	৩০৪	৯৩৪
মেরুদন্ডহীন	৫৮২	৭০২	৪২২	৯৪১	২,৬৪৭
উদ্ভিদ	৩,৬৩২	৫,৬৮৭	১১,৪৮৫	৫,৩০২	২৬,১০৬

উৎসঃ Global Biodiversity, পরিবেশ অধিদপ্তর

এ প্রেক্ষাপটে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে । বনের গাছপালা প্রচুর সংখ্যক প্রাণী, সরীসৃপ, পাখী ও কীট পতঙ্গের আবাসস্থল রূপে কাজ করে। বনের গাছপালায় আশ্রয় নিয়ে জীবজন্তু তাদের বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। সুতরাং বনের পরিবেশ ও পরিসর রক্ষা করা গেলে তা অবশ্যই জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়তা করবে।

(ঙ) জলবায়ু শরণার্থী হ্রাস ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আজ বিশ্বব্যাপী 'জলবায়ু শরণার্থী'র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বে প্রতি ৪৫ জনে একজন এবং বাংলাদেশে প্রতি ৭ জনে একজন জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার। যেসব এলাকায় জলবায়ু শরণার্থী বৃদ্ধি পাচ্ছে বা পাবার সম্ভাবনা সেসব এলাকায় সঠিক ও পরিকল্পিত বন সৃজন করলে শরণার্থী সংখ্যা হ্রাস পাবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় চাই সুষ্ঠ ও পরিকল্পিত বনায়ন। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিম্নলিখিত বনায়ন কার্যক্রমগুলো হাতে নেয়া যেতে পারে।

- কমিউনিটি বনায়ন
- কৃষি সম্পৃক্ত বনায়ন
- বাণিজ্যিক বনায়ন
- গ্রামীণ বনায়ন
- উপকূলীয় বনায়ন
- অবাণিজ্যিক বনায়ন
- অংশীদারিত্ব বনায়ন
- নগর বনায়ন
- বসতবাড়ি বনায়ন

অভিযোজন (Adaptation) ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও দুর্যোগ হ্রাসের নিমিত্ত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে আচরণগত পরিবর্তন (Adjustment) হল অভিযোজন (Adaptation)।

- অভিযোজন হলো প্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া।
- অভিযোজনকে আমরা বলতে পারি সবচেয়ে বিপন্ন মানুষের বিপন্নতা হ্রাসের জন্য তার খাপ খাওয়ানো
- ক্ষমতা (অভিযোজন ক্ষমতা) বাড়ানোর একটি প্রক্রিয়া।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ মোকাবেলা করা ও সুযোগ-সুবিধাগুলোকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই অভিযোজনের উদ্দেশ্য।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বনের ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বন সহায়তা করে থাকে। সামাজিকভাবে ও পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল পুনঃবনায়ন (Reforestation) ও বন পুনঃপ্রতিষ্ঠার (Restoration) মাধ্যমে বর্তমান বনসমূহের সঠিক

ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষের আচ্ছাদন (Tree Cover) এর প্রসার, জীবিকায়ন ও পরিবেশের উপকারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে যা জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে মানুষ ও প্রতিবেশ উভয় ক্ষেত্রে সহায়তা করে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বনের ভূমিকা অনেক, কয়েকটি ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক) নিরাপদ বেষ্টনী ঃ

সম্প্রদায়/জনগোষ্ঠীর (Community) জন্য বনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ নিরাপদ বেষ্টনী, যা জলবায়ুর আঘাত (Climate shocks) মোকাবেলায় (Cope) তাদের (কমিউনিটি) সহায়তা করে। শস্যের তুলানায় অনেক বনজ দ্রব্য জলবায়ু পরিবর্তনের তারতম্য (Climate variability) ও এর আপদ (Extremes) দমনে অনেক সহনীয় (Resilient), এবং যা স্থানীয় জীবিকায়নে আপদ মোকাবেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি অনাবৃষ্টির (Drought) কারণে ফসলের ক্ষতি হয় অথবা বন্যার কারণে সম্পদের ক্ষতি হয়, তখন কমিউনিটি আয়ের জন্য বন ও বৃক্ষের উৎপাদিত দ্রব্য - যথা কাঠ, জ্বালনি কাঠ ও কাঠের বাইরে অন্যান্য বনজ উৎপাদন (Non-Timber Forest Products-NTFPs) বিক্রি করতে পারে। এছাড়া তারা বনের উৎপাদিত দ্রব্যাদি খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করতে পারে- যেমন ছত্রাক (Mushrooms), সাগু (Sago), ফল এবং গুল্ম (Bush)। তাছাড়া বৃক্ষ হতে উৎপাদিত পশুখাদ্য (Fodder) অনাবৃষ্টির সময়ে গবাদি পশুর বেঁচে থাকা নিশ্চিত করে।

খ) কৃষি ঃ

বৃক্ষ কৃষি ভূমির মাটি রক্ষা করে এবং মাটির পানি ও অতি ক্ষুদ্র জলবায়ু (Microclimate) নিয়ন্ত্রণ করে, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের তারতম্য (Climate variability) হতে শস্য ও গবাদিপশু সংরক্ষণ করে। কৃষিবনায়ন (Agroforestry) এ উৎপন্ন শস্যসমূহ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি (Excess precipitation), এবং তাপমাত্রার তারতম্য (Temperature fluctuations) ও চরম তাপমাত্রা (Extreme temperature) মোকাবেলায় আরো বেশী সক্ষম (Resilient)। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকায় এক গবেষণায় দেখা গেছে, শিম জাতীয় গাছ (Leguminous trees) কৃষিকে অনাবৃষ্টি মোকাবেলায় আরো সক্ষম করে তোলে পানি পরিশ্রাবণ/অনুপ্রবেশ (Infiltration) উন্নয়নের মাধ্যমে এবং উৎপাদন ক্ষমতা (Productivity) বৃদ্ধি করে নাইট্রোজেন সংযোজন (Fixation) এর মাধ্যমে । বাংলাদেশেও সীম জাতীয় লতা গাছ নাইট্রোজেন সংযোজন করে থাকে। খরার সময় বিশেষ করে শীতে গাছ প্রস্বেদন (Transpiration) এর মাধ্যমে কৃষি জমিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

গ) উপকূলসমূহ (Coasts) ঃ

উপকূলীয় বনসমূহ যেমন প্যারাবন (Mangroves) দুর্যোগের ঝুঁকি বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চরম দুর্যোগ (ঝড় অথবা ঘূর্ণিঝড়) ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (উপকূলীয় বন্যা) হ্রাস করে। ভারত ও ভিয়েতনামে গবেষণায় দেখা গেছে ঝড়, ঘূর্ণিঝড় অথবা উপকূলীয় বন্যায় প্যারাবন হতে দূরের বসতিসমূহ (Settlements) ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী তাদের থেকে যাদের বসতিসমূহ প্যারাবন সংলগ্ন উপকূলের নিকটবর্তী।

ঘ) শহরসমূহ ঃ

নগর বন ও বৃক্ষসমূহ শহরের মধ্যে ছায়া, বাষ্পীভূত ঠান্ডা (Evaporative cooling), এবং বৃষ্টির পানি অভিগ্রহণ (Interception), মজুত (Storage) ও পরিশ্রাবণ/অনুপ্রবেশ (Infiltration) এর মাধ্যমে সবুজ অবকাঠামো (Green infrastructure) গড়ে তোলে। তাপ প্রবাহের (Heat waves) সময় তাপমাত্রা হ্রাস করে এ সকল সবুজ অবকাঠামো নগরে জলবায়ুর তারতম্য ও পরিবর্তন এর অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঙ) আঞ্চলিক জলবায়ু (Regional climate) ঃ

গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনসমূহ বৃষ্টিপাতে (Precipitation) প্রভাব বিস্তার করে এবং বাষ্পীভবন (Evaporation) ও মেঘ বৃদ্ধি করে একটি অঞ্চলকে শীতল (Cooling) রাখতে ভূমিকা রাখে। বিস্তৃত এলাকায় এটা সংঘটিত হয়ঃ উদাহরণস্বরূপ, আর্দ্র (Humid) ক্রান্তিরেখায় (Tropic) ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন মধ্য ও উপরের অক্ষাংশের (Latitude) বৃষ্টিপাতে প্রভাব ফেলে।

জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি (National Adaptation Programme of Action-NAPAs) ঃ

মানুষের অভিযোজন পরিকল্পনায় বন ও বৃক্ষসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজ স্বীকৃত, এই সকল পরিকল্পনাসমূহ জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচিতে প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে কিছু উদাহরণ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যেমন বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার উপকূলীয় এলাকার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে (Vulnerable communities) রক্ষার জন্য প্যারাবন সংরক্ষণ অথবা পুনর্বাসন (Rehabilitation), এবং বেনিন এর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা ও জ্বালানি কাঠ সরবরাহের জন্য প্যারাবন সংরক্ষণ অথবা পুনর্বাসন করা। কারিগরী অথবা অবকাঠামোগত অভিযোজনের কার্যকরীতা বৃদ্ধি ও সহায়তায় বন ও বৃক্ষের ভূমিকা অনেক, তাছাড়া জীবিকায়ন, জীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসেও বন ও বৃক্ষের উপকারীতা অনেক।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে জলাভূমির ভূমিকা ঃ

বায়ুমন্ডলের প্রথম স্তরে যেসকল গ্রীনহাউস গ্যাস প্রবেশ করে, তাদের পরিমাণ কমানোকে প্রশমন (Mitigation) বলে। আর যেসকল কার্যক্রমের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ হ্রাস করা যায় তাকে অভিযোজন বলে। জলাভূমির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে।

প্রশমন ঃ

কিছু জলাভূমি গুরুত্বপূর্ণ উপকার করে থাকে, যেমন জলসিক্ত ভূমি (Peatland), প্যারাবন (Mangroves) এবং লবণাক্ত জলাভূমিগুলো (Saltmarshes) কার্বন মজুত (Stores) বা আধার (Sinks) হিসাবে কাজ করে। স্বাস্থ্যবান (Healthy), অক্ষত (Intact) জলসিক্ত ভূমিগুলো অধিক পরিমাণ কার্বনে সমৃদ্ধশালী যেখানে নর্দমা (Drainage), জলসিক্ত হবার ফলে বিনষ্ট উদ্ভিজ্জ পদার্থ (Peat) এর উত্তোলন (Extraction) এবং দহন (Burning) এর মাধ্যমে কার্বন বায়ুমন্ডলে মুক্ত (Release) হয় গ্রীনহাউস গ্যাস আকারে (Form)। সাম্প্রতিক একটি পর্যবেক্ষণে (Study) দেখা গেছে যে জলসিক্ত ভূমিগুলোর ক্ষতি

(Damage) বার্ষিক গ্রীনহাউস গ্যাসগুলোর নিঃসরণের জন্য দায়ী, যা বিশ্বের জীবাশ্ম জ্বালানির ১০% নিঃসরণের সমতুল্য।

তবে, ইহা একটি জটিল বিষয় (Issue) তারপর একেক জলাভূমির একেক স্তরের কার্বন মজুত ও নিঃসরণ (Release) বিভিন্ন ধরনের। ইহা একটি সার্বিক (Overall) ভারসাম্য (Balance) এবং এই বিষয়টিই হচ্ছে চলমান (Continuous) গবেষণার (Research)।

অভিযোজন ঃ

জলাভূমিগুলো নিজেরাই হুমকির সম্মুখীন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে, আবার বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে কিছু ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের বিপরীতে সঠিক ব্যবস্থাপনার জলাভূমিগুলো আমাদের সংস্থান করে (Provide) সবচেয়ে ভাল বিমা-চুক্তিসমূহ।

উপকূলীয় জলাভূমি যেমন প্যারাবন, জোয়ার-ভাটার সমতলভূমি (Tidal flats) এবং লবণাক্ত জলাভূমিগুলো ঝড় ও জোয়ার-ভাটার তরঙ্গ (Tidal surges) এর গতিকে হ্রাস করে, পক্ষান্তরে জলাভূমির উদ্ভিদগুলোর শিকড়সমূহ সমুদ্রের তীরকে (Shorelines) দৃঢ় বা সুস্থিত করে (Stabilize) এবং ভূমিক্ষয় (Erosion) কমায়। যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ হারিকেন/প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়গুলোর (Hurricanes) প্রভাবসমূহের উপর সাম্প্রতিক একটি মডেলিং (Modelling) পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে প্রতি হেক্টর উপকূলীয় জলাভূমি গড়ে ৩৩,০০০ মার্কিন ডলার ক্ষতি নিবারণ করে (Prevent)।

প্রাকৃতিকভাবে , সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় জলাভূমিগুলো ক্রমান্বয়ে দেশের অভ্যন্তরের (Inland) দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বাস্তবতা হলো, অনেক উপকূলীয় জলাভূমিগুলো ব্যাপকভাবে পরিণত হচ্ছে কৃষি, শিল্প এবং শহর ও নগরে। আক্ষরিকভাবে (Literally) প্রবাহের জন্যে (To move to) কোথাও জলাভূমির প্রতিবেশ নাই এবং একদিকে উন্মুক্ত সমুদ্র, অন্যদিকে চুন বা বালির সাথে সিমেন্টের মিশ্রণে তৈরি নির্মাণসামগ্রী (Concrete) এর চাপের দরুণ (Squeeze) জলাভূমিগুলো অনবরত (Ever) সরু হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু জলাভূমিগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে (Shrink), তাই এগুলোর উপকার বা সেবা সমূহ যা অবারিত (Free) ভাবে দিয়ে যাচ্ছে তা কি আমরা পাব? পক্ষান্তরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ (Dangers) সর্বদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলাভূমির নেটওয়ার্ক ও করিডোরগুলো (Corridors) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জলাভূমির উপর নির্ভরশীল উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের নতুন এলাকায় যেতে সহায়তা করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, জলাভূমিগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের 'নিরাপদ বেষ্টনী' (Safty net) এর সংস্থান (Provide) করে কেবলমাত্র যদি সকল দেশ একসাথে কাজ করেঃ

- জলাভূমির অন্যান্য (জলবায়ু সংক্রান্ত ব্যতীত) হুমকিসমূহ পরিহার (Avoid) বা নূন্যতম পর্যায়ে (Minimize) আনা যাতে এই প্রতিবেশগুলো যতটুকু সম্ভব বিস্তৃত (Extensive) ও স্বাস্থ্যবান (Healthy) থাকে;
- যেসকল জলাভূমিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধবংস হয়েছে সেগুলো পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা (Restore); এবং

- জলাভূমি সৃষ্টির জন্য সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা যেখানে ইহার সুস্পষ্ট উপকার থাকবে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে।

সংরক্ষণ ও সঠিক পরিকল্পনা, বিদ্যমান জলাভূমিগুলোর সঠিক ব্যবহার, ধবংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত জলাভূমিগুলো সম্মিলিতভাবে (Combined) পূর্বাবাস্থায় ফিরিয়ে আনা, যাতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সঠিকভাবে সমন্বিত সুদূর-প্রসারি (Wider) উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে ভূমি ও পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলোকে একত্রে নিয়ে আসা - যেমন কৃষি, পানির সরবরাহ এবং শক্তি (Energy) - যা জলবায়ু সহনীয় নীতিসমূহে প্রভাব ফেলে।

সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) কি ?

- সহ-ব্যবস্থাপনা হলো কোন একটি এলাকা বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশিদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ (Borrini-Feyerbund, IUCN:2000)। Co-management or Collaborative management is “A situation in which two or more social actors negotiate, define and guarantee amongst themselves a fair sharing of the management functions, entitlements and responsibilities for a given territory, area or set of natural resources." (Borrini-Feyerbund, IUCN: 2000).
- **প্রজ্ঞাপনঃ** সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সকল রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গণ্য হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮ তারিখ ঃ ২৩/১১/২০০৯ খ্রিঃ।

-ঃ প্রজ্ঞাপন ঃ-

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন বিভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভূভাগ ও জলভাগের রক্ষিত এলাকা সমূহ যৌথভাবে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার আওতাধীন হবে এবং উল্লিখিত রক্ষিত এলাকা সমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে। স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রক্ষিত এলাকাসমূহের উৎপাদন/পণ্য ও সেবা ভোগের সুযোগ সৃষ্টি ও সুষম বন্টনের ব্যবস্থা থাকায় উল্লিখিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা (**Eco System**) টেকসই হবে। রক্ষিত ও তৎসংলগ্ন এলাকার (Landscape) অর্ন্তভূক্ত স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের উন্নয়নে অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন/পণ্য ও সেবা বন্টন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতামূলক ও সুশাসনের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ও আশেপাশের মূল স্টেকহোল্ডারদের (Stakeholders) পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার্থে নিম্নোক্তভাবে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হলো।

২.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council)

মাননীয় সংসদ সদস্য - উপদেষ্টা
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান - উপদেষ্টা
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - উপদেষ্টা

(ক)	সুশীল সমাজ :	
	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী	
	সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা (সর্বোচ্চ)	৫ জন
(খ)	স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও সরকার ঃ	
	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও)	১ জন
	সহকারী বন সংরক্ষক	১ জন
	সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার	১ জন
	সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার/	
	স্টেশন অফিসার (সর্বোচ্চ)	৫ জন
	পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধি	১ জন
	পার্শ্ববর্তী ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার	১ জন
	বি.ডি.আর/কোস্টগার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১ জন
	রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার	
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)	৫ জন
	(ন্যূনতম দুই জন মহিলা এবং এক জন পুরুষ সদস্যসহ)	
(গ)	স্থানীয় জনগোষ্ঠী	
	বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)	৪ জন
	স্থানীয় নৃত্বাত্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	৩ জন
	বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি	৫ জন
	কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপের প্রতিনিধি	৫ জন
	পিপলস্ ফোরাম/সম্পদ ব্যবহারকারী ফেডারেশন প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)	২২ জন

রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের স্থানীয় গ্রাম সমূহের সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে পিপলস্ ফোরাম গঠিত হবে। গ্রামের অধিবাসীগণ পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এ ক্ষেত্রে পিপলস্ ফোরামের ৩৩% সদস্য হতে হবে মহিলা ।

(ঘ)	অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)	৫ জন

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- মৎস্য অধিদপ্তর
- পরিবেশ অধিদপ্তর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- সমাজ সেবা অধিদপ্তর

২.১ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রক্ষিত এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুইবার সভায় মিলিত হবে।সদস্য সচিব সভা আহবান করবেন।

প্রয়োজনে সদস্য সচিব ৭ দিনের নোটিসে সভা আহবান করতে পারবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সর্বোচ্চ ৬৫ জন সদস্য থাকবে । তন্মধ্যে ন্যুনতম ১৫জন মহিলা সদস্য থাকবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবে । প্রতি চার বছরে নির্বাচনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কাউন্সিল গঠিত হবে। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকবেন।

২.২ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (Co-management Council) কার্যপরিধি ঃ

ক. স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা;

খ. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা;

গ. রক্ষিত ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা;

ঘ. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা;

ঙ. রক্ষিত এলাকা হতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীদারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নীতিনির্ধারণ ও পরামর্শ প্রদান করা;

চ. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কিংবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন দ্বন্ধ বা বিবাদ দেখা দিলে তা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা;

ছ. সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করা;

জ. বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠান করা ।

৩.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co-management Committee)ঃ

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও)	উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
সদস্যঃ	
সহকারী বন সংরক্ষক	১ জন (পদাধিকারবলে)
সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা (সদস্য-সচিব)	১ জন (পদাধিকারবলে)
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (একজন অবশ্যই মহিলা হবেন)	২ জন
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	২ জন
পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি	৬ জন
বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি	২ জন
বনজ সম্পদ ব্যবহারকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	১ জন
নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিনিধি	২ জন
পেট্রোলিং গ্রুপের প্রতিনিধি	৩ জন
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ, বি.ডি.আর, কোস্ট গার্ড)	২ জন
সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	১ জন
সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার / স্টেশন অফিসার-সর্বোচ্চ	৫ জন
পার্শ্ববর্তী রেঞ্জ অফিসারগণ -	১ জন

সদস্যদের মধ্যে ন্যুনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকবে।

৩.১ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপসমূহ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে ।
পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্যগণ ছাড়া সকল সদস্যই ২ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন ।
কোন ব্যক্তিই একাধিক্রমে দুইবারের বেশী মেয়াদের জন্য কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।
সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত করবেন।
কমিটির হিসাবাদি সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

৩.১.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি নিজস্ব অফিস থাকবে যা যথাসম্ভব বন অফিসের কাছাকাছি স্থাপিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে একজন পূর্ণকালীন হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকবে। উক্ত কর্মকর্তা কমিটির আর্থিক ও অন্যান্য রেকর্ডাদি সংরক্ষণ করবে। উপদেষ্টাগণের দিক-নির্দেশনামতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন প্রতি বছর অডিট করাতে হবে। হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার কার্যাবলীর জন্য সদস্য-সচিবের নিকট দায়ী থাকবে। তার বেতনাদি কমিটির নিজস্ব তহবিল হতে বহন করা হবে। সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সদস্য-সচিব সভা আহবান করবেন এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.১.১ হিসাব রক্ষক - কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ অন্যান্য নিয়োগের নিয়োগবিধি ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলাবিধি সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৩.১.২ কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৯ জন হবে।

৩.১.৩ কমিটির সদস্যগণ মাসে ন্যূনতম ১ (এক) বার সভায় মিলিত হবেন। সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিতি সভার কোরাম হিসাবে গণ্য করা হবে।

৩.২ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি ঃ

ক. রক্ষিত এলাকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা ;

খ. রক্ষিত এলাকার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পরিকল্পিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল Mobilization এর ব্যবস্থা করা ;

গ. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা;

ঘ. সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় চুক্তির মাধ্যমে কোন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলকভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করা;

ঙ. রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় (Landscape) বন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনায় পিপলস্ ফোরামের সহ-যোগিতায় রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা;

চ. রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় রাজস্ব আহরণ ও অর্থায়ন ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ছ. রক্ষিত এলাকায় বন বিভাগ সহ স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিতদের মধ্যে পণ্য, সেবা ও সুফল যৌক্তিকভাবে বণ্টন এবং টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

জ. ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ভূমি জোনিং (Zoning) কার্যক্রম এবং হেবিটেট (Habitat) পূনরুদ্ধার পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে রক্ষিত এলাকা ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে যথাযথ বিবেচনান্তে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

ঝ. রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণে বন বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে পিপলস্ ফোরামের সমর্থনমূলে পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঞ. রক্ষিত এলাকা কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও টেকসই করার নিমিত্তে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ ও তা রক্ষিত এলাকায় ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যুক্তিসংগত ভাবে বণ্টন নিশ্চিত করা;

ট. সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দ্বন্ধ দেখা দিলে তা নিরসনে উদ্দোগী ভূমিকা গ্রহণ করা ;

ঠ. সরকার অনুমোদিত নির্দেশিকা মতে এন্ট্রি ফি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথার্থভাবে ব্যয় নিশ্চিত করা;

ড. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের প্রতিটি সভায় উপস্থাপন করা;

ঢ. পিপলস্ ফোরামের সহযোগিতাক্রমে ছাত্রদের ডরমিটরি, দর্শকদের সুবিধাদিসহ কমিউনিটির সম্পত্তি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রহণ করা;

ণ. বাফার জোনে (Buffer Zone) বাগান সৃজন ও সৃজিত বনের সুফল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি ও পদ্ধতি মতে বন্টন, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা;

ত. রক্ষিত এলাকার বা কোর এলাকার বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা;

থ. বাফার জোনে (Buffer Zone) বাগান সৃজনে অংশীদার নির্বাচনে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করা;

দ. এ কমিটি সকল কার্যক্রমের জন্য পিপলস্ ফোরাম এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকবে।

৪. এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৪.১ নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং সহ - ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত অত্র মন্ত্রণালয়ের ১৫ মে ২০০৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং- পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ -৬৪/অংশ-৪/১১২ এতদ্বারা রহিত করা হলো। তবে এ রহিতকরণ সত্ত্বেও ঐ বিজ্ঞপ্তি বলে গৃহীত চলমান কার্যক্রম অত্র বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অব্যাহত রয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত

(জয়নাল আবেদীন তালুকদার)
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

নং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮ তারিখ ঃ ২৩/১১/২০০৯ খ্রিঃ।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, স্থানীয় সরকার ও পলী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪। মহা-পরিচালক, এনজিও বিষয়ক বুর্যো, মৎস্য ভবন, ১০তম তলা, রমনা, ঢাকা।
১৫। প্রকল্প পরিচালক, সমাপ্তকৃত নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৬। জেলা প্রশাসক, (সকল)।

এরপর সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও সংগঠনের সূত্রপাত করুন এবং নিম্নের বিষয়টি নিয়ে উপস্থাপনা ও আলোচনা করুন।

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কি?

- বাংলাদেশ বন বিভাগ জন্মলগ্ন থেকেই বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে নিয়োজিত। বস্তুতঃপক্ষে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বন ও বনজ সম্পদ এর সুষ্ঠ ব্যবহার ও সরকারী রাজস্ব আহরণ বন ব্যবস্থাপনার মূখ্য উদ্দেশ্য। তবে কালের প্রবাহে এটা প্রতীয়মান যে, বন বিভাগ এর পক্ষে একা একা এই সম্পদ রক্ষা বা ব্যবস্থাপনার কাজটি শুধুমাত্র কঠিনই নয় দুঃসাধ্যও বটে। এর কারণ বন বিভাগ এর সামর্থ্য ও সম্পদ এর সীমাবদ্ধতা। এ ছাড়াও বিশ্বের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় জনগণের সহায়তা ও অংশগ্রহণ ছাড়া শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়।

- এ কারণে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে এবং এই অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হবে ***Equitable Benefit Sharing অর্থাৎ সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার এর সুষম বন্টন।*** অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।
- *বাংলাদেশ সরকার প্রজ্ঞাপনের (পবম/পরিশা/৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮, তারিখ ২৩/১১/২০০৯) মাধ্যমে বিভিন্ন রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের অনুমোদন প্রদান করেছেন।*

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কি ?

- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন-দ্বিস্তর বিশিষ্ট। প্রথম স্তর বা নীতি নির্ধারণী স্তর হিসাবে কাজ করবে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি।

- এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সাধারণ দরিদ্র মানুষ বা সম্পদ ব্যবহারকারীদের সাথে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবেন পিপলস্ ফোরাম (Peoples Forum)। মূলতঃ এই ফোরাম সাধারণ মানুষের **'কথা বলার মঞ্চ'** হিসাবে কাজ করবে।

কে হবেন সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য?

➢ জিজ্ঞাসা করুন, কে হবেন সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য? কয়েকটি উত্তর শোনার পর সদস্য সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শন করুন। যা নিম্নরূপ-

- প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার মাননীয় সাংসদ, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের উপদেষ্টা, সভাপতি ও সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন যথাক্রমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ফরেষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা।
- এই কাউন্সিলের সদস্য হবেন সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার সহকারী বন সংরক্ষক সহ বীট কর্মকর্তাবৃন্দ ও পার্শ্ববর্তী রেঞ্জ এর দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি পেট্রোল দল এর প্রতিনিধিবৃন্দও এই কাউন্সিলের সদস্য হবেন ।
- কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ৬৫ জন এবং এর মধ্যে ন্যুনতম ১৫ জন থাকবেন মহিলা।

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কাঠামো ঃ

➢ এবার নিম্নরূপ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল গঠনের Framework নিয়ে আলোচনা করুন।

- মাননীয় সাংসদ - - - উপদেষ্টা
- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান - - - উপদেষ্টা
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - - - উপদেষ্টা

সদস্য ঃ

সুশীল সমাজ ঃ

(ক) গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা (সর্বোচ্চ) - ৫ জন

(খ) স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও সরকার ঃ

- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও.) - - ১ জন
- সহকারী বন সংরক্ষক - - ১ জন
- সংশ্লিষ্ট ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার - - ১ জন
- সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার/ স্টেশন অফিসার (সর্বোচ্চ) - - ৫ জন
- পুলিশের বিভাগের প্রতিনিধি - - ১ জন
- পার্শ্ববর্তী ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার - - ১ জন
- বি.জি.বি/কোস্টগার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) - - ১ জন
- রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) - - ৫ জন (ন্যূনতম দুই জন মহিলা এবং এক জন পুরুষ সদস্যসহ)

(গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠী

- বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) - ৪ জন
- স্থানীয় নৃত্বাত্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি - - ৩ জন
- বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি - - ৫ জন
- কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপের প্রতিনিধি - - ৫ জন
- পিপলস্ ফোরাম/সম্পদ ব্যবহারকারী ফেডারেশন প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) - - ২২ জন

রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের স্থানীয় গ্রাম সমূহের সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে পিপলস্ ফোরাম গঠিত হবে। গ্রামের অধিবাসীগণ পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এ ক্ষেত্রে পিপলস্ ফোরামের ৩৩% সদস্য হতে হবে মহিলা ।

(ঘ) অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) - - ৫ জন

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- মৎস্য অধিদপ্তর
- পরিবেশ অধিদপ্তর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- সমাজ সেবা অধিদপ্তর

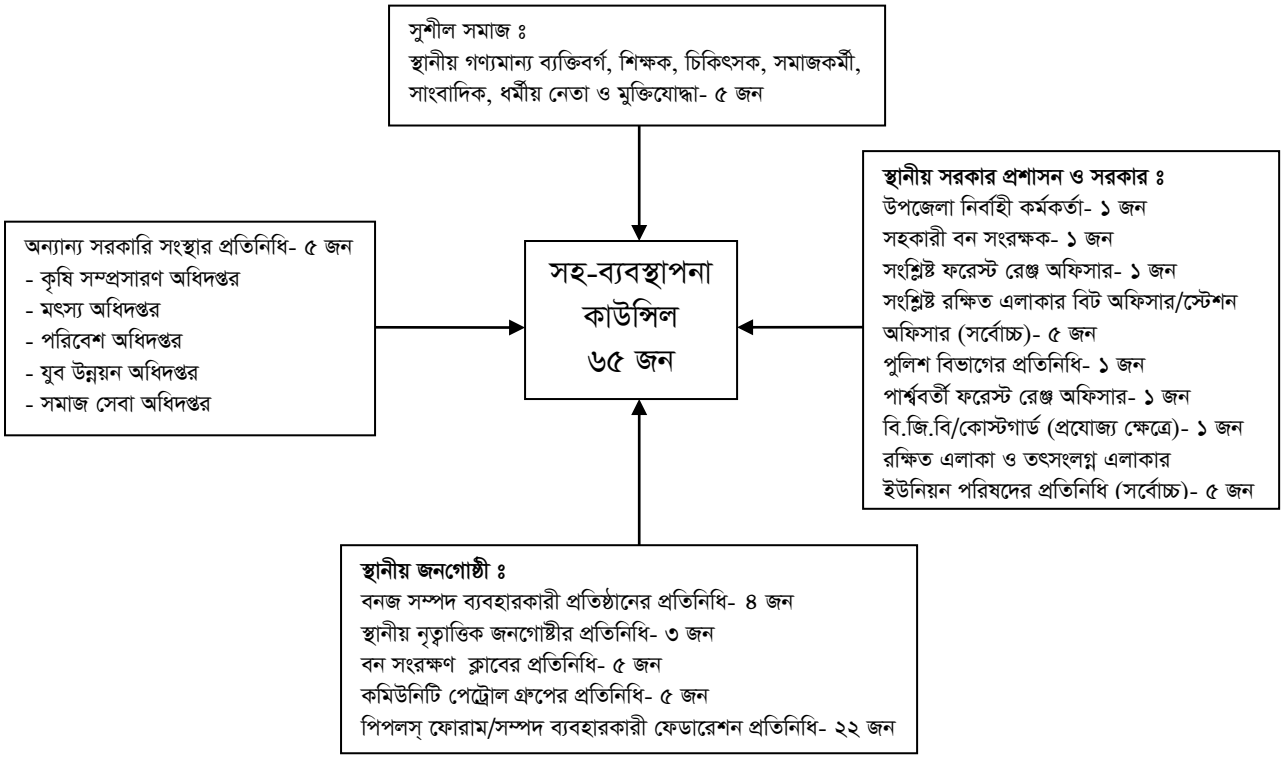

চিত্রঃ সহ-ব্যবস্থাপনা কউন্সিলের গঠন প্রক্রিয়া ও কাঠামো।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রক্ষিত এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুইবার সভায় মিলিত হবে। সদস্য সচিব সভা আহবান করবেন। প্রয়োজনে সদস্য সচিব ৭ দিনের নোটিসে সভা আহবান করতে পারবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সর্বোচ্চ

৬৫ জন সদস্য থাকবে । তন্মধ্যে ন্যূনতম ১৫জন মহিলা সদস্য থাকবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবে । প্রতি চার বছরে নির্বাচনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কাউন্সিল গঠিত হবে। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকবেন ।

কাউন্সিলের সদস্যপদের সময়সীমা কি ?

- শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের থেকে জানতে চান কাউন্সিলের সদস্যপদের সময়সীমা কি? সময়সীমা শেষ হলে কি ধরনের পদক্ষেপ নেন? অতঃপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শন ও আলোচনা করুন।

- সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর। কাজেই পরিষদের সকল সদস্যপদ হবে চার বছর মেয়াদী। এরপর সংশ্লিষ্ট সদস্য অবসরে যাবেন। পরবর্তী সময়ের জন্য প্রত্যেক স্টেকহোল্ডার দল তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য/সদস্যাদেরকে নির্বাচন করবেন। যারা দু'কার্যকালে অংশগ্রহণ করেছেন, তারা একটি কার্যকাল বিরতি দেয়ার পর পুনরায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন।

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্যপরিধি ঃ

- সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্যপরিধি পাওয়ার পয়েন্টে প্রর্দশন করুন ও ব্যাখ্যা করুন-

- স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা ;
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা ;
- রক্ষিত ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা ;
- রক্ষিত এলাকা হতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীদারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নীতিনির্ধারণ ও পরামর্শ প্রদান করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কিংবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন দ্বন্দ্ব বা বিবাদ দেখা দিলে তা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করা;
- বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠান করা ।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co-management Committee)

কে হবেন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ?

➢ এবার সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করুন এবং বলুন-

- সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্যরা ক্যাটাগরী অনুযায়ী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচন করবেন। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হবেন সর্বোচ্চ ২৯ জন এবং এর মধ্যে কমপক্ষে ৫ জন মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকার বলে উপদেষ্টা হবেন এবং সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। সদস্যরাই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মধ্য হতে সভাপতি নির্বাচিত করবেন।
- প্রতিমাসে সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রম পর্যালোচনা করবেন ও পরবর্তী মাসের কার্যক্রমের পরিকল্পনা করবেন।

কমিটির সদস্যপদের সময়সীমা কি ?

➢ অতঃপর কমিটির সদস্যপদের সময়সীমা নিয়ে আলোচনা করুন-

- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর;
- একজন সদস্য পরপর দু'বারের বেশি কমিটিতে থাকবেন না। ন্যূনতম ১ বছর বিরতি দিয়ে পুনরায় নির্বাচনের উপযুক্ত হতে হবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামোঃ

➢ এবার সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো নিয়ে আলোচনা করুন এবং বলুন-

- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - - উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও.) - - উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)

সদস্য:

- সহকারী বন সংরক্ষক - - ১ জন (পদাধিকারবলে)
- সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা (সদস্য-সচিব) - - ১ জন (পদাধিকারবলে)
- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (একজন অবশ্যই মহিলা হবেন) - - ২ জন
- সুশীল সমাজের প্রতিনিধি - - ২ জন
- পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি - - ৬ জন
- বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি - - ২ জন
- বনজ সম্পদ ব্যবহারকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি - ১ জন
- নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিনিধি - - ২ জন
- পেট্রোলিং গ্রুপের প্রতিনিধি - - ৩ জন
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ, বি.ডি.আর, কোস্ট গার্ড) - - ২ জন

- সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি - - ১ জন
- সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার / স্টেশন অফিসার-সর্বোচ্চ - - ৫ জন
- পার্শ্ববর্তী রেঞ্জ অফিসারগণ - - ১ জন

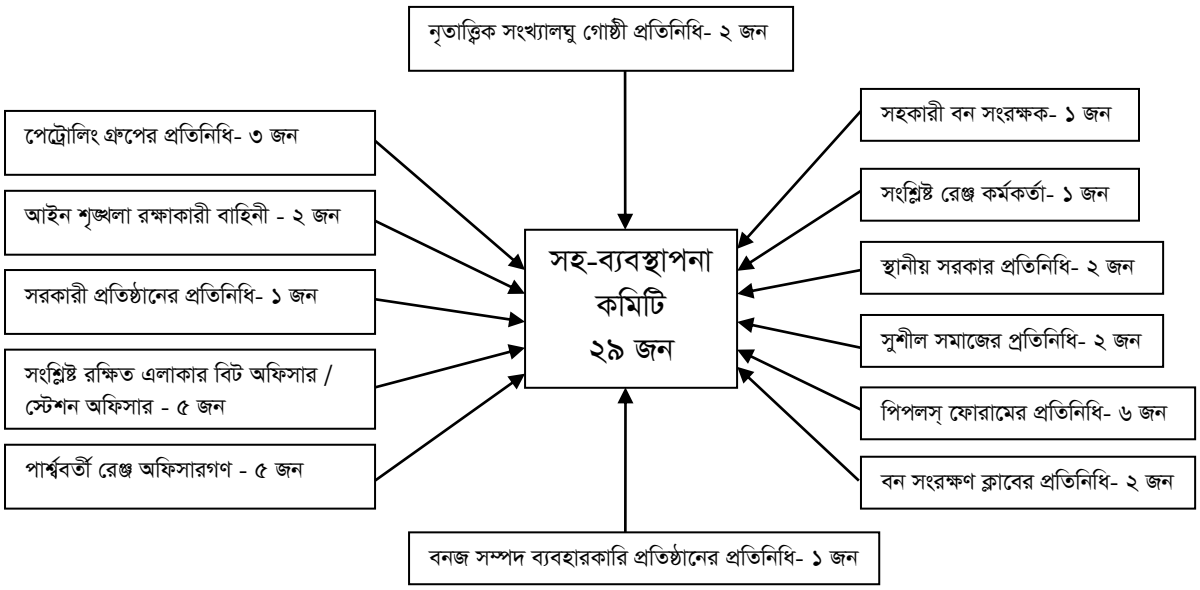

চিত্রঃ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন কাঠামো।

- সদস্যদের মধ্যে ন্যুনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকবে;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপসমূহ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্যগণ ছাড়া সকল সদস্যই ২ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন;
- কোন ব্যক্তিই একাধিক্রমে দুইবারের বেশী মেয়াদের জন্য কমিটির সদস্য হতে পারবেন না;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত করবেন;
- কমিটির হিসাবাদি সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে;
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি নিজস্ব অফিস থাকবে যা যথাসম্ভব বন অফিসের কাছাকাছি স্থাপিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে একজন পূর্ণকালীন হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকবে। উক্ত কর্মকর্তা কমিটির আর্থিক ও অন্যান্য রেকর্ডাদি সংরক্ষণ করবে। উপদেষ্টাগণের দিক-নির্দেশনামতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন প্রতি বছর অডিট করাতে হবে। হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার কার্যাবলীর জন্য সদস্য-সচিবের নিকট দায়ী থাকবে। তার বেতনাদি কমিটির নিজস্ব তহবিল হতে বহন করা হবে। সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সদস্য-সচিব সভা আহবান করবেন এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন;
- কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৯ জন হবে;
- কমিটির সদস্যগণ মাসে ন্যূনতম ১ (এক) বার সভায় মিলিত হবেন। সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিতি সভার কোরাম হিসাবে গণ্য করা হবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি ঃ

- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি পাওয়ার পয়েন্টে প্রর্দশন করুন ও ব্যাখ্যা করুন-

- রক্ষিত এলাকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা ;
- রক্ষিত এলাকার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পরিকল্পিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল Mobilization এর ব্যবস্থা করা;
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় চুক্তির মাধ্যমে কোন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলকভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করা;
- রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় (Landscape) বন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনায় পিপলস্ ফোরামের সহোযোগিতায় রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা ;
- রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় রাজস্ব আহরণ ও অর্থায়ন ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- রক্ষিত এলাকায় বন বিভাগসহ স্থানীয় ষ্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিতদের মধ্যে পণ্য, সেবা ও সুফল যৌক্তিকভাবে বণ্টন এবং টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ভুমি জোনিং কার্যক্রম এবং হেবিটেট পূনরুদ্ধার পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে রক্ষিত এলাকা ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে যথাযথ বিবেচনান্তে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণে বন বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে পিপলস্ ফোরামের সমর্থনমূলে পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- রক্ষিত এলাকা কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও টেকসই করার নিমিত্তে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ ও তা রক্ষিত এলাকায় ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যুক্তিসংগত ভাবে বণ্টন নিশ্চিত করা;
- সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসনে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা;
- সরকার অনুমোদিত নির্দেশিকা মতে এন্ট্রি ফি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথার্থভাবে ব্যয় নিশ্চিত করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের প্রতিটি সভায় উপস্থাপন করা ;
- পিপলস ফোরামের সহযোগিতাক্রমে ছাত্রদের ডরমিটরি, দর্শকদের সুবিধাদিসহ কমিউনিটির সম্পত্তি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
- বাফার জোনে বাগান সৃজন ও সৃজিত বনের সুফল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি ও পদ্ধতি মতে বন্টন, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা ;
- রক্ষিত এলাকার বা কোর এলাকার বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ;
- বাফার জোনে বাগান সৃজনে অংশীদার নির্বাচনে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করা ;

দলীয় কাজ ঃ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন ও প্রশমনের কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক সংখ্যা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ/ক্ষতিসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য কৌশল	বাস্তবায়নের জন্য কারা কিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন	সময় কাল	অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও উৎস্য

অধিবেশন
৪

শিরোনাম ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন (সমাজভিত্তিক)

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খাপ খাওয়ানো/অভিযোজন এর ধারণা জানতে পারবেন;
- জলবায়ু পরিবর্তনে সমাজভিত্তিক অভিযোজনের ধরনসমূহ জানতে পারবেন;
- মহিলাদের ঝুঁকির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিশুদের ঝুঁকির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে বলতে পারবেন; এবং
- বনায়ন খাতের ঝুঁকির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১.	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খাপ খাওয়ানো/অভিযোজন	ঝোড়ো ভাবনা, পোস্টার প্রদর্শন/দৃশ্যমান উপস্থাপনা	ফ্লিপশীট ও মার্কার, পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া	৩০ মিনিট
২.	শিশু ও নারীদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায়	কার্ড লিখন ও দৃশ্যমান উপস্থাপনা	ভিপকার্ড ও মার্কার, মাল্টিমিডিয়া	২০ মিনিট
৩.	অভিযোজনের উপায়সমূহ	পোস্টার প্রদর্শন/দৃশ্যমান উপস্থাপনা	পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া ও মার্কার	১০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খাপ খাওয়ানো/অভিযোজন

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খাপ খাওয়ানো/অভিযোজন এর ধারণা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ঝোড়ো ভাবনা (মুক্ত চিন্তার ঝড়) পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। নিচের প্রশ্নগুলো ধারাবাহিকভাবে করার মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন-
    - অভিযোজন কি ? এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের উত্তরগুলো ফিপ্লা শীটে লিখে আলোচনা করা যেতে পারে।
    - জলবায়ু পরিবর্তনে সমাজভিত্তিক অভিযোজনগুলো কি কি ?

- উল্লেখিত প্রশ্নাবলী আলোচনা ও দৃশ্যমান উপস্থাপনার সময় হ্যান্ডআউট/সংযোজনীতে উল্লেখিত অভিযোজন ও সমাজভিত্তিক অভিযোজনগুলোর সহায়তা নিতে পারেন। তবে, সহায়ক এক্ষেত্রে বিকল্প কৌশলও অনুসন্ধান করতে পারেন।

শিশু ও নারীদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায়

- শিশু ও নারীদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায়সমূহ আলোচনার জন্য দৃশ্যমান উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরিচালনা করা যেতে পারে। অথবা
- অংশগ্রহণকারীদের ত্রয়ীদলে (প্রতি তিন জনে ১টি দল) ভাগ করে প্রতি দলকে শিশুদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য ২টি উপায় ও নারীদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য ২টি উপায় ভিপকার্ডে লিখতে দেওয়া যেতে পারে। লেখা শেষে কাডর্গুলো সংগ্রহ করে ভিপবোর্ডে গুচ্ছ করে তা আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনার সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায় বাদ পড়লে তা সংযোজন করা যেতে পারে।

অভিযোজনের উপায়সমূহ

- এ পর্যায়ে অভিযোজনের উপায়সমূহের ওপর তৈরিকৃত পোস্টার বোর্ডে বা প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়ালে ঝুলিয়ে বা মাল্টিমিডিয়ায় দৃশ্যমান করে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

- সবশেষে আলোচনার সারসংক্ষেপ করা প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ যা একজন সহায়ক/প্রশিক্ষক হিসেবে অনুসরণ করতে পারেন।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খাপ খাওয়ানো/অভিযোজন এর ধারণা

- অভিযোজন হচ্ছে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে স্বাস্থ্য, সম্পদ ও কল্যানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমানোর চেষ্টা করে;
- যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ পরিবেশের সুযোগগুলিকে তাদের নিজেদের সুবিধার্থে কাজে লাগায় তাই অভিযোজন;
- অভিযোজন হচ্ছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধির সাথে খাপ খাওয়ানো এবং জলবায়ু জনিত বিপদাপন্নতা হ্রাস করা;
- অভিযোজন হচ্ছে বিপদাপন্নতা হ্রাস করার জন্য সকল আচরণ বা অর্থনৈতিক কাঠোমোর সাথে খাপ খাওয়ানো; এবং
- অভিযোজন স্বতঃস্ফুর্ত বা পরিকল্পনা অনুযায়ী হতে পারে এবং ঘটনা ঘটার পর বা ঘটার উপলব্ধি সহায়তার মাধ্যমে হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনে সমাজভিত্তিক অভিযোজন ঃ

ক) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন ঃ

- কম সময়ে পাকে এবং লবণ সহিষ্ণু এমন শস্য ও ধানের জাত উদ্ভাবন করে তার চাষ করতে হবে
- এলাকায় বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো অকাল বন্যা ও ঝড় সহিষ্ণু করে তৈরী করতে হবে;
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে হবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে নিরুৎসাহিত করতে হবে;
- কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত পরিবর্তন আনতে হবে, দুর্যোগ সময়ের আগেই কাটা যায় এমন ফসলের চাষ করতে হবে;
- ভাসমান সবজী বাগান করে এবং উঁচু পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে;
- প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এলাকা ভিত্তিক গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে আপদকালীন সময়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা যেতে পারে;
- শুষ্ক মৌসুমে ফসল চাষ করার জন্য পানি ধরে রাখতে স্থানীয় পুকুর, ডোবা, রাস্তার বা বাঁধের পাশের নিচু জায়গা পুনঃখনন করা যেতে পারে; এবং
- এছাড়াও আরো যেসব উদ্যোগ নিতে হবে তা হলো
  - পলিথিলিন ব্যাগে সব্জি চাষ
  - বালি মাটিতে তরমুজ ও মিষ্টি কুমড়া চাষ
  - নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে খাঁচায় মাছ চাষ
  - জলমগ্ন এলাকায় ধাপ তৈরী করে তাতে সব্জি চাষ
  - স্কুল মাঠে পশু সম্পদ রাখার জন্য উচু জায়গা যা কিল্লা নামে পরিচিত তৈরী করা
  - উঁচু মাচা তৈরী করে তাতে সব্জি চাষ

– শস্য বীজ রক্ষায় বীজ সংরক্ষণাগার তৈরী করা

জলমগ্ন এলাকায় ধাপে সব্জি চাষ

মাচায় সব্জি চাষ

বীজ সংরক্ষণ

বীজ সংরক্ষণ

খ) খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির অভিযোজন ঃ

- প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জলাভূমি, বনাঞ্চল, উপকূলীয় সম্পদ এবং ম্যানগ্রোভ যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ব্যবহার করতে পারে এবং এগুলো হতে খাদ্য ও জীবিকায়নের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে;
- জীবিকায়নের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় ফসলের চাষ করা যেতে পারে;
- মৌসুমি ফল ও সব্জির প্রক্রিয়াজাত করা যেতে পারে যাতে এটা জীবন ধারণের বিকল্প হতে পারে;
- ফসল ও খাদ্য সামগ্রীর প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে; এবং

- ফসল উৎপাদন ও প্রাপ্যতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে হবে। শুধুমাত্র ভাতের উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য যেমন- আলু, রুটি, বিভিন্ন ফল ও সব্জি খাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে;

গ) পানি ও লবণাক্ততা ঝুঁকির অভিযোজন ঃ

- শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে ফসল ও মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে পুরানো ও অব্যবহৃত পুকুর পুনঃখননের ব্যবস্থা করে মৎস্য চাষ করা যেতে পারে;
- বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ পানি বাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;
- ভূ-উপরিভাগের পানি পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজ করা;
- গ্রাম পর্যায়ে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ;
- নদী খালের পানি বিশুদ্ধ রাখা ও পয়ঃ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে;
- স্লুইস গেটের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও খাল খননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূর করতে হবে;
- ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে চক্রাকারে (Recycle) পানি শোধন করে ব্যবহার করতে হবে;
- লবণাক্ত ও আর্সেনিক দূষণ এলাকার জন্য বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- শুষ্ক মৌসুমে সুপেয় ও ব্যবহারযোগ্য পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;
- সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে হবে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে (সাইক্লোন সেন্টারে) মিঠা পানি ও সুপেয় পানি নিশ্চিত করতে হবে;
- বিশুদ্ধ পানির ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করার জন্য কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে;
- জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য শুস্ক মৌসুমে পানি ধরে রাখার জন্য ভরাট হয়ে যাওয়া নদী, খাল, পুকুর ইত্যাদি খনন ও পুনঃখনন করতে হবে; এবং
- কল-কারখানায় বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক চালু রাখার জন্য সরকারের তরফ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঘ) স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন ঃ

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কি ধরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসুচি গ্রহণ করা;
- যেহেতু জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর প্রভাব আমাদের জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ সেহেতু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া আশু প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপক গনসচেতনতা প্রয়োজন;

- জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা মোকাবেলায় সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে উন্নত করতে হবে;
- কলেরা প্রবণ এলাকায় রোগ শুরু হবার পূর্বেই প্রতিরোধক ব্যবস্থা জোরদার করার কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে। বন্যার পূর্বেই বন্যাকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকীর মাত্রা অনুযায়ী এলাকা চিহ্নিত করা এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা। যেমন- ডায়রিয়া প্রবণ এলাকা, ডেঙ্গু প্রবণ এলাকা, জলোচ্ছ্বাস বা বন্যা প্রবণ এলাকার স্বাস্থ্য সমস্যা ইত্যাদি;
- খাদ্যের মান ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে জনগণকে সচেতন করে তোলা; এবং
- উপকূলীয় এলাকায় মশা, মাছি ও অন্যান্য পরজীবি নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

ঙ) উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন ঃ

- এলাকা ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থার উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোনিং করে সে মতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যেমন- লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে এমন অঞ্চল, সাগরের পানিতে তলিয়ে যাবে এরকম অঞ্চল, খরাক্রান্ত বা বন্যা কবলিত হবে এমন অঞ্চল ইত্যাদি;
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জলবায়ু পরিবর্তন, এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানোর উপায়ের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে;
- প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করার পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে; এবং
- শিল্পায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

চ) খরা ঝুঁকির অভিযোজন ঃ

- খরা বৃদ্ধির ফলে ফসল হানি ঘটছে, দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। অনাহারে-অর্ধাহারে ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে ব্যপকহারে;
- অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। ফলে জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের যোগান (মাছ, শাক্-সবজি) কমে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে খাদ্যের অভাবসহ মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং দরিদ্র জনগণের খাদ্য ঝুঁকি বাড়বে;
- উক্ত সমস্যা মোকাবেলার জন্য ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে হবে। শুধু ভাতের উপর নির্ভরশীল না থেকে খাদ্য হিসাবে রুটি, আলু ও নানাবিধ ফসলের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে; এবং
- সুষম খাদ্যের ব্যানারে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

শিশুদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায়

- প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রকোপ দেখা দেয় এবং এতে শিশুরাই অধিক হারে আক্রান্ত হয়। শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;
- শিশুরা যাতে জলবায়ু সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণা স্কুল ও পারিবারিক পর্যায়ে কাজে লাগাতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে;
- শিশুদের উপযোগী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপকরণ তৈরী করে প্রতিটি শিশুর কাছে তা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে;
- স্কুলের শিক্ষক ও পারিবারিক পর্যায়ে পিতা-মাতাকে সচেতন করতে হবে, যাতে তারা শিশুদের জলবায়ু সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে; এবং
- দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বসবাসরত শিশুদের জন্য বিশেষ সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

নারীদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায়

- নারীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তারা উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেশী মাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে;
- গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কর্মসুচী নিতে হবে;
- দুর্যোগ সংক্রান্ত আগাম সর্তকতার তথ্য মহিলারা যাতে সঠিক সময়ে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে;
- নারীদের পারিবারিক ও গতানুগতিক কাজের চাপ কমিয়ে তাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা দুর্যোগ বা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ এবং সেই মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে মহিলাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে; এবং
- দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেন্ডার সমতায়ন নীতিমালা পর্যালোচনা করে এর সঠিক বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বনায়ন খাতের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায়

- পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা রেখে সবুজ বেষ্টনী ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে উপকূলের বসতির নিরাপত্তা ও বিপদাপন্নতা কমানো যায়;
- বনজ উৎপাদন উপকূলবাসীর জীবিকায় মূখ্যভাবে সহায়তা দেয় এবং গৃহের আংশিক প্রয়োজন মেটায়;
- উপকূলীয় বনায়ন ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন; এবং

- উপকূলীয় এলাকায় বনজ সম্পদের উপর চাপ কমাতে বিকল্প জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করাও অতি জরুরি।

অভিযোজনের উপায়সমূহ
• সচেতনতা বৃদ্ধি করা; • গ্রাম-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় দল গঠন করা; • গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন; • দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ; • দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ করা; • কমিউনিটি ভিত্তিক সঞ্চয় তহবিল গঠন; • গ্রাম ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন; • সময়মত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর; • কমিউনিটি ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ; • এলাকাভিত্তিক গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ; • বেড়ীবাঁধ/বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ; • বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন; • বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ; • ভাসমান সবজি চাষ; • বন্যা সহিষ্ণু নলকূপ স্থাপন; • বন্যা সহিষ্ণু পায়খানা স্থাপন; • খরা/জলাবদ্ধতা/লবনাক্ত সহিষ্ণু ফসলের চাষ; • বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ; • কমিউনিটি ভিত্তিক বীজ ভান্ডার তৈরি; • উন্নত চুলা ব্যবহার; • জীবিকা বহুমূখীকরণ; • খাঁচায় মাছ চাষ; • বসতবাড়ীতে সবজিচাষ; • বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; • উন্নত সেচ সুবিধা।

অধিবেশন
৫

শিরোনাম ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে জেন্ডার প্রসঙ্গ

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- জেন্ডার ও নারীর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জেন্ডার ও সাধারণ নীতিসমূহ জানতে পারবেন;
- নারীদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময়ঃ ১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১.	জেন্ডার	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপশীট ও মার্কার	১০ মিনিট
২.	জলবায়ু পরিবর্তনে নারীদের উপর প্রভাব	আলোচনা ও দৃশ্যমান উপস্থাপনা	ফ্লিপশীট, কার্ড ও মার্কার	৩০ মিনিট
৩.	নারীদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায়	ঝোড়ো ভাবনা, পোস্টার প্রদর্শন/দৃশ্যমান উপস্থাপনা	ফ্লিপশীট ও মার্কার/পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া	২০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

<u>জেন্ডার</u>

- জেন্ডার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে-
  - ➢ জেন্ডার কি ?
  - ➢ জেন্ডারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিন ?
  - ➢ জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে জেন্ডারকে প্রভাবিত করে ?

- আলোচনার সময় জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তনে এর উপর প্রভাব বিষয়ে তাঁদের বলা মতামতসমূহ ফ্লিপশীটে লিখে আলোচনা করা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনে নারীদের উপর প্রভাব

- এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাবসমূহের সাথে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় করিয়ে দেয়া যেতে পারে এবং প্রত্যক্ষ প্রভাবসমূহের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- এই পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫/৬টি দলে ভাগ করে জলবায়ু পরিবর্তনে নারীদের উপর যেসব প্রভাব পরে তার মধ্যে ৪/৫টি প্রভাব দলে লিখতে দেয়া যেতে পারে। লিখিত প্রভাবসমূহ সবার সামনে উপস্থাপন করে তাদের মতামতসমূহ শুনা যেতে পারে। প্রয়োজনে সংযোজনীর সহায়তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- জলবায়ু পরিবর্তনে নারীদের উপর প্রভাব আলোচনার পর জলবায়ু পরিবর্তন ও নারী, বর্তমান অবস্থা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জেন্ডার ও সাধারণ নীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

নারীদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায়

- এ পর্যায়ে প্রশ্ন করে নারীদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায়সমূহ নিয়ে আলোচন করা যেতে পারে। অথবা
- নারীদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায়সমূহ এর ওপর তৈরিকৃত পোস্টার বোর্ডে বা প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়ালে ঝুলিয়ে বা মাল্টিমিডিয়ায় দৃশ্যমান করে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

- সবশেষে আলোচনার সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে।

জেন্ডার ঃ

জেন্ডার বলতে বুঝায় সামাজিকভাবে সৃষ্ট দায়িত্ব (Socially constructed roles), আচরণ (Behaviours), কর্মকান্ড (Activities) এবং গুণ (Attribute) সমূহ, যা একটি সমাজ বিবেচনা করে নারী ও পুরুষের জন্য সঠিক।

জেন্ডার বলতে আরো বুঝায় নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্কঃ বেশীরভাগ সমাজে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অধিকার ও সুযোগগুলির মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকে তাকে জেন্ডার বলে। যেমন কয়েকটি অধিকার ও সুযোগসমূহ হচ্ছে ভূমির অধিকার, সম্পদ, কাজের সুযোগ ও পারিশ্রমিক, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।

জেন্ডার বৈশিষ্ট্যের কিছু উদাহরণ ঃ

- পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশে, পুরুষদের তুলনায় নারীরা গৃহস্থলীর কাজ বেশী করে থাকে
- আমেরিকায় (এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে), একই রকম কাজে পুরুষদের তুলনায় নারীরা কম পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে
- সৌদি আরবে পুরুষদের গাড়ী চালানোর অনুমতি আছে কিন্তু নারীদের নেই

জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার ঃ

- জেন্ডারের অবিচারসমূহ (Inequities) প্রভাব ফেলে সম্পদ, শিক্ষা, চাকুরি, ভূমির অধিকার (Tenancy) ও নিয়ন্ত্রণে এবং পরিকল্পনা তৈরীতে তাদের অংশগ্রহণে, এছাড়া আরো অন্যান্য উপাদানসমূহ যা জলবায়ু পরবর্তনে নারীদেরকে বিপদাপন্ন করে তোলে। খরার প্রকোপ বেশী হলে নারীদের পরিশ্রম বেড়ে যায়, অনেক দূর থেকে পানি বহন করে আনতে হয়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় উপকূলে নারীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে কারণ তারা অনেক সময় আগাম বিপদসঙ্কেত পায় না এবং আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনে নারীদের উপর প্রভাব ঃ

প্রত্যক্ষ প্রভাব	উদাহরণ	নারীদের উপর প্রভাব
খরার প্রকোপ ও পানি স্বল্পতা	• বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খরার প্রভাব দিন দিন বাড়ছে	• নারী ও কিশোরী মেয়েরাই প্রধানত পানি সংগ্রহ করে থাকে তাই পানির অভাব হলে তাদের উপর কাজের চাপ বেড়ে যায় • মেয়েদের স্কুল থেকে ঝড়ে পাড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে • নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকে
জলবায়ু জনিত দুর্যোগ	• সাইক্লোন, হারিকেন, বন্যা, শৈত্য প্রবাহ, তাপ প্রবাহ, গরম বাতাস এগুলোর প্রকোপ বেড়ে গেছে। • বাংলাদেশের জলবায়ু জনিত দুর্যোগসমূহঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা ও নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, ভূমি ধ্বস, উঁচ্চ জোয়ার, বজ্রপাত/কালবৈশাখী/টর্ণেডো	• ১৪১ টা দেশের উপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, ১৯৮১-২০০২ সাল পর্যন্ত পুরুষদের চেয়ে নারীরা মারা গেছে বেশী • নারীরা পুরুষদের চেয়ে কম বয়সে মারা গেছে
রোগব্যাধি বেড়ে যাবে	• বাংলাদেশে কলেরার প্রকোপ ৭০% বেড়ে গেছে • গবাদি পশুর রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে	• নারীদের স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ কম • পরিবারের অসুস্থ্য ব্যক্তিদের সেবাযত্ন করায় তাদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয় যা তাদের কজের চাপ বাড়িয়ে দেয় • নারী প্রধান পরিবারের পক্ষে কৃষির নতুন কোন প্রযুক্তি অথবা গবাদি পশুর মৃত্যু ঝুঁকি কমানোর জন্য নতুন কৌশল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে
প্রজাতি হারিয়ে যাওয়া	২০৫০ সালের মধ্যে ১৮-৩৫% হারে প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে	নারীরা জলবায়ুর পরিবর্তনে কিছু ফসলের বৈচিত্রকরণ করতে পারতো কিন্তু তাপমাত্রার অস্বাভাবিক পরিবর্তন তাদের ঔষধ, বনজ, ফলজ, কৃষির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে যা অবশেষে খাদ্য ও স্বাস্থ্যের উপর মারাত্বক প্রভাব ফেলছে
কৃষি ফলন কমে যাবে	আফ্রিকায় ২০-৫০% ফলন কমে গেছে	• গ্রামের নারীরা খাদ্য উৎপাদনে ৫০% ভূমিকা রাখে যা উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে ৬০-৮০% • নারীদের কাজে অংশগ্রহণ কমে যাবে যা তাদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যের উপর মারাত্বক প্রভাব ফেলবে

জলবায়ু পরিবর্তন ও নারী ঃ

- জ্বালানী কাঠের সরবরাহ ও পানির অধিক স্বল্পতা দেখা দিবে;
    - অনুমান করা হয় যে মাটি ও পানির সংরক্ষণে নারীরা কাজে সহায়তা করে বিনা পারিশ্রমিকে, এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নীতির পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় তাদের বাদ দেওয়া হয় ;
- কাজের খোঁজে পুরুষরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে, ফলে নারীদের গৃহস্থালী কাজের চাপ বেড়ে যায়, যা তাদের লাভজনক (Remunerate) কর্মকান্ড করার সময় হ্রাস করে, এবং বাড়ির দায়দায়িত্ব পালনে একা হয়ে যায়;
    - নারী প্রধান বাড়িগুলি সাধারণত দরিদ্র অবস্থার কারণে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
    - সম্পদের নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার ছাড়া, নারীদের পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা কম সম্ভাবনা থাকে;
- ঘূর্ণিঝড়ের সময় উপকূলে নারীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে কারণ তারা অনেক সময় আগাম বিপদসঙ্কেত পায় না এবং আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়;
    - বাড়ী থেকে অনেক দূরে
    - ধারনক্ষমতা কম
    - নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে
    - সুপেয় পানি ও শৌচাগারের অভাব

- অধিক সামাজিক বিপদাপন্নতা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কম দক্ষতার সমস্যা ও নারীদেরকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে;
    - নারীরা পৃথিবীর শরণার্থীদের ৮০% প্রতিনিধিত্ব করে;
    - ৭০-৮০% জরুরী অবস্থায়, জনগণের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

বর্তমান অবস্থা ঃ

- জলবায়ু পরিবর্তনের পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে জেন্ডারের ব্যাপ্তি বিবেচনা করা হয়না;
- মূল পদক্ষেপ নেওয়া হয় গ্রীনহাউস গ্যাস প্রশমনে, এবং কম মনোযোগ দেওয়া হয় অভিযোজন কৌশলে;
- হুমকিসমূহের পার্থক্যের আলোকে জেন্ডার এবং পুরুষ ও নারীর দক্ষতাকে সমাজে যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে দেখা হয়না ।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জেন্ডার ও সাধারণ নীতিসমূহ ঃ

- জেন্ডার দ্বারা পার্থক্য করা সম্পদ ব্যবহারকারীদের বোঝানো ও পথ প্রদর্শন করা;
    - জেন্ডারের পরিসংখ্যানগত পার্থক্য
- স্বীকৃতি দেওয়া যে দরিদ্রতা (তাদের জেন্ডার অবস্থার প্রেক্ষিতে) নারীদের খুব বেশী বিপদাপন্ন করে, সুতরাং তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা থাকবে;
    - পার্থক্যকরণ ও প্রয়োগের পদ্ধতিসমূহের কার্যক্রম তৈরী করা
- বেঁচে থাকার কৌশল ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের সামর্থ্যসমূহ (Abilities) ও দক্ষতাগুলি চিহ্নিত করা,

- সাধারণ কর্মকর্তাদের সচেতন করা ও নারীদের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করা,
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ জোরদার করা,
- ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের সুযোগ রাখা।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে নারী ঃ

নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে, যদিও তাদের অংশগ্রহণকে উপেক্ষা করা হয় বা কম স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের অনেক কাজ প্রশমন কাজে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে, নারীরা অনেক কাজ করে তাদের পরিবারের সদস্যদের মঙ্গলের জন্য, যা একই সঙ্গে অভিযোজন প্রক্রিয়া পরিকল্পনায় তাৎপর্যপূর্ণ। নারীরা গৃহস্থলীর সম্পদ ব্যবহারে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে বিশেষ করে খাদ্য ঘাটতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়। বসতবাড়ির উৎপাদনে তারা তাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে এবং কৃষিকাজ ছাড়া অন্যান্য উৎপাদনের উপায়সমূহ খোঁজে তাদের পরিবারের মঙ্গলের জন্য। তাছাড়া, নারীরা মাটি ও পানি সংরক্ষণে কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়নে অবদান রাখে এবং বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা পরিহার (Avoid) করে যা অনেক বড় অবদান রাখে জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রচেষ্টা (Effort) গ্রহণে।

বাংলাদেশে নারীরা দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্য কিছু কৌশল গ্রহণ করে। জলাবদ্ধতার সময় ছোট বাচ্চাদের পানিতে ডুবে মরা থেকে রক্ষা করার জন্য মায়েরা সর্বদা বাচ্চাদেরকে তাদের কাছে নিয়ে ঘুমায় এবং অনেক সময় জাগ্রত থাকে। পরিবারগুলো আশ্রয় নেয় বাড়ির চালে/ছাদে সাধারণতঃ নবজাত শিশু ও ছোট বাচ্চাদের দেহের সাথে প্লাস্টিক বোতল বেঁধে যাতে তারা পানিতে ডুবে না যায়। গ্রাম অঞ্চলে নারীরা সাধারণতঃ মাটির পরিবর্তে বাঁশ ও কাঠের তৈরী গৃহ নির্মাণ করে, যাতে বন্যার সময় ঘরের নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে পারে। তাছাড়া, ঘরের ভিত্তির (Plinth) উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয় একটি নির্দিষ্ট স্তর (Level) পর্যন্ত যাতে জলাবদ্ধতার সময় ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। ঘরের ভিতর চাল/ছাদের সম উচ্চতায় মাচা (Platform) তৈরী করা হয় সম্পদের মালিকানার দলিলপত্র/জায়গার চুক্তিপত্র, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র/দলিলসমূহ, শুকনো খাবার (চিড়া, মুড়ি) চাল, ডাল, লবণ, চিনি প্রভৃতি, দিয়াশলাইয়ের কাঠি, মোমবাতি, কেরোসিন, কাঁথা (Quilt), বীজ ইত্যাদি নিরাপদে রাখার জন্য জলাবদ্ধতা ও বন্যার সময়।

সংসার পরিচালনা, বাচ্চাদের যত্ন নেওয়া, শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা গড়ে তোলা, বনায়ন ও পুনর্বনায়নে নিজেদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীরা আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশমনে। নারীরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করতে পারে পানি ও শক্তির (Power) অপব্যাবহর (Abuse) পরিহার করে এবং ভোগকৃত দ্রব্যের (Consumption) ব্যবহারে (Behaviour) সামান্য পরিবর্তনের দ্বারা যেমন কেনাকাটার জন্য পলিথিন (যা ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয়) এর পরিবর্তে পুনঃব্যবহারযোগ্য পাটের ব্যাগের ব্যবহার, গ্যাসের চুলা বন্ধরাখা যখন রান্না হয়না, পরিবারের সদস্যবৃন্দকে স্থানীয় খাদ্য দ্বারা ভোজন কারানো (Stuffs), কম দুরত্বের ক্ষেত্রে পরিবহনের পরিবর্তে বাচ্চাদেরকে হেঁটে স্কুলে নেওয়া ইত্যাদি।

বনসমূহ প্রয়োজন কার্বন আধারের জন্য, বনসমূহ আরো প্রাসঙ্গিক (Relevant) ও মুখ্য (Salient) পুরুষদের থেকে নারীদের জন্য, যেখানে নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Crucial) ভূমিকা (Role) পালন করে - কৃষাণী (Farmers), ফসল আহরণকারী (Harvesters), জ্বালানি কাঠ ব্যবহারকারী, অপ্রধান বনজ দ্রব্য (Minor forest products) সংগ্রহকারী ও বিক্রেতা এবং গবাদিপশুর তদারককারী (Tenders) হিসাবে। এছাড়া বনায়ন, পুনঃবনায়ন কর্মসূচী ও বন উজাড় করা (Deforestation) থামাতে (Halt)

নারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে। গ্রাম অঞ্চলে নারীদের দৈনন্দিন বাড়ির আঙ্গিনায় বনায়ন কার্যক্রম ছাড়াও বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় বনায়ন কার্যক্রমে নারীরাই প্রধান কাজের শক্তি।

নারীদের ঝুঁকির সংগে খাপ খাওয়ানোর সম্ভাব্য উপায় ঃ

- নারীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তারা উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেশী মাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে
- গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নারীদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কমসূচি নিতে হবে
    - নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে
    - নারীদের দক্ষতা আরো জোড়ালোভাবে বৃদ্ধি করতে হবে
    - পাশাপাশি পুরুষদেরকে সচেতন করতে হবে
- দুর্যোগ সংক্রান্ত আগাম সর্তকতার তথ্য নারীরা যাতে সঠিক সময়ে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে
    - নারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে
        - তাদের নিজস্ব চাহিদা/অধিকার সনাক্ত করা
        - তাদের চাহিদা বিশে- ষণ করার ক্ষমতা
        - একত্রে সমাধানের পথ খুঁজে বের কারা
        - সিদ্ধান্ত নেয়া
- নারীদের পারিবারিক ও গতানুগতিক কাজের চাপ কমিয়ে তাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা দুর্যোগ বা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ এবং সেই মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে নারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।
    - প্রচলিত এবং অপ্রচলিত জীবিকায়নের ব্যবস্থা বাড়াতে হবে।
    - পণ্যের সঠিক বাজারজাতকরণ এবং বাজার অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে
- দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেন্ডার সমতায়ন নীতিমালা পর্যালোচনা করে এর সঠিক বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
    - সরকারী কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জেন্ডার, জলবায়ু পরিবর্তন, নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে
    - জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তনের নীতিমালা ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহিলা প্রতিনিধি রাখা।

ঘটনা বিশ্লেষণ (Case Study) ঃ

বন রক্ষায় নারী

টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের খুরশিদা বেগম বনের যৌথ অংশীদারিত্বের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার ‘ওয়াঙ্গারী ম্যাথাই (Wangari Maathai) পুরস্কার ২০১২ অর্জন করেছে। সহ-ব্যবস্থাপনায় তার প্রচেষ্টা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে নেতৃত্ব প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এ পুরস্কার পান। পুরস্কার গ্রহণের জন্য খুরশিদা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ বাংলাদেশ থেকে ইটালির রাজধানী রোমের উদ্দেশ্যে রওনা হন । Wangari Maathai এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (Food and Agricultural Organization-FAO) তৃতীয় বিশ্ব বন সপ্তাহের সভায় তিনি পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। খুরশিদা বেগম পুরস্কারটি গ্রহণ করে একজন প্রথম নারী পরিবর্তনকারী হিসাবে তাঁর সমাজে ও প্রাকৃতিক সম্পদ যথা বন ও জলাশয় সংরক্ষণে নারীদের আরো অধিক সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। খুরশিদা প্রথম নারী যিনি বাংলাদেশে প্রথম নারী কমিউনিটি পাহারা দলের (Community Patrol Group-CPG) সূচনা করেন।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সনদ

First Wangari Maathai Award winner Kurshida Begum and FAO Assistant Director-General for Forestry Eduardo Rojas-Briales

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখায় স্থানীয় শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন

অধিবেশন ৬

	শিরোনাম ঃ সামাজিক বনায়ন ও এর উন্নত ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ	

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- সামাজিক বনায়ন কি এবং কিভাবে স্থানীয় জনগণ সামাজিক বনায়ন করতে পারে তা জানতে পারবেন;
- সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণের অধিকার কারা পাবেন এবং সামাজিক বনায়নে চুক্তির পক্ষদের চিহ্নিত করতে পারবেন; এবং
- সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ ও চুক্তি নবায়নের পদ্ধতি এবং কিভাবে সামাজিক বনায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করতে পারবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কিভাবে এই সামাজিক বনায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী উপকৃত হতে পারবে তা জানতে পারবেন;
- কিভাবে যৌথব্যবস্থাপনা এবং পার্টনার এসোসিয়েশন এই প্রক্রিয়ায় সাড়া দেবে তা জানতে পারবেন; এবং

সময় ঃ ১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১.	সামাজিক বনায়ন, স্থানীয় জনগণ ও সামাজিক বনায়ন এবং সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণের অধিকার	ঝোড়ো ভাবনা, আলোচনা	ফ্লিপশীট ও মার্কার	২০ মিনিট
২.	সামাজিক বনায়নে চুক্তির সমর্থনকারী, সমাজিক বনায়নে চুক্তির মেয়াদ ও নবায়নের পদ্ধতি, ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সামাজিক বনায়ন এবং সামাজিক বনায়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ	দলীয় কাজ ও আলোচনা এবং দৃশ্যমান উপস্থাপনা	তথ্যপত্র, ফ্লিপশীট ও মার্কার, পোস্টার, মাল্টিমিডিয়া	২০ মিনিট
৩.	সামাজিক বনায়ন হতে লব্ধ আয়ের বন্টন, উপকারভোগীদের দায়িত্ব ও সুবিধা হস্তান্তর এবং যেভাবে যৌথব্যবস্থাপনা এবং পার্টনার এসোসিয়েশন এই প্রক্রিয়ায় সাড়া দেবে	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপশীট ও মার্কার	২০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

সামাজিক বনায়ন, স্থানীয় জনগণ ও সামাজিক বনায়ন এবং সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণের অধিকার

- শুরুতেই প্রশ্ন করা যেতে পারে সামাজিক বনায়ন কি? তাঁদের উত্তরগুলোর সাথে সংযোজনীর তথ্য মিলিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- এবার বলা যেতে পারে, কিভাবে স্থানীয় জনগণ সামাজিক বনায়ন করতে পারেন ও সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণের অধিকার কারা পাবেন।

সামাজিক বনায়নে চুক্তির সমর্থনকারী, সামাজিক বনায়নে চুক্তির মেয়াদ ও নবায়নের পদ্ধতি, ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সামাজিক বনায়ন এবং সামাজিক বনায়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ

- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করে নিম্নে উল্লেখিত চারটি বিষয় ৪টি দলকে বণ্টন করে দিয়ে দলীয় মতামত ফিপ্লা শীটে লেখে আনতে বলা যেতে পারে।
- ৪টি বিষয় হতে পারে-
    - সামাজিক বনায়নে চুক্তির সমর্থনকারী কারা?
    - সমাজিক বনায়নে চুক্তির মেয়াদ ও নবায়নের পদ্ধতি কি?
    - ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সামাজিক বনায়নের প্রক্রিয়া কি?
    - কিভাবে সামাজিক বনায়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটি অংশগ্রহণ করতে পারে?

- দলীয় কাজের জন্য সময় দেয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের পর উপস্থাপনার জন্য দলগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। দলীয় উপস্থাপনা শেষে সংযোজনীর সহায়তায় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অথবা মাল্টিমিডিয়াতে উপস্থাপন করে আলোচনা করা যেতে পারে।

সামাজিক বনায়ন হতে লব্ধ আয়ের বন্টন, উপকারভোগীদের দায়িত্ব ও সুবিধা হস্তান্তর এবং যেভাবে যৌথব্যবস্থাপনা এবং পার্টনার এসোসিয়েশন এই প্রক্রিয়ায় সাড়া দেবে

- এ পর্যায়ে সামাজিক বনায়ন হতে লব্ধ আয়ের বন্টন, উপকারভোগীদের দায়িত্ব ও সুবিধা হস্তান্তর এবং যৌথব্যবস্থাপনা এবং পার্টনার এসোসিয়েশন কিভাবে এই প্রক্রিয়ায় সাড়া দেবে তা প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের উত্তরের সূত্র ধরে সংযোজনী এর সহায়তা নিয়ে বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

- সবশেষে আলোচনার সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে।

সামাজিক বনায়ন ঃ

সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন গড়ে তোলা বা বন সৃষ্টি করাকে সামাজিক বনায়ন বলে।

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র-বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সে সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন উপশম ও অভিযোজনে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

যেভাবে স্থানীয় জনগণ সামাজিক বনায়ন করতে পারবেন ঃ

- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এর (এস.আর ও নং ১০-আইন/২০১০, জানুয়ারী ১৩, ২০১০) বিধি ৩ অনুসারে বনায়নের উপযোগী বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী নিজেদের উদ্যোগে সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তর এর বীট ও রেঞ্জ কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে পারবেন
- যথার্থতা বিবেচনা করে বন অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে বনায়নের অনুমোদন প্রদান করবেন।

সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণের অধিকার যারা পাবেন ঃ

- স্থানীয় জনগণ; এবং
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এর (এস.আর ও নং ১০-আইন/২০১০, জানুয়ারী ১৩, ২০১০) উপবিধি ৪ (স) অনুযায়ী সামাজিক বনায়ন এলাকার ১ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্যে থেকে অংশগ্রহণকারী নির্বাচিত হবেন।

তবে এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ অধিকার পাবেন-

- ভূমিহীন
- ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক
- দুঃস্থ মহিলা
- অনগ্রসর গোষ্ঠী
- দরিদ্র আদিবাসী
- দরিদ্র ফরেষ্ট ভিলেজার
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা কিংবা মুক্তিযোদ্ধার অসচ্ছল সন্তান।

সামাজিক বনায়নে চুক্তির সমর্থনকারী ঃ

- সামজিক বনায়নের জন্য পারস্পারিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;
- উক্ত চুক্তি সম্পাদনে বন অধিদপ্তর, ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্ত্বাধিকারী কোন ব্যক্তি বা সংবিধিবদ্ধ কোন সংস্থা, উপকারভোগী এবং বেসরকারী সংস্থা চুক্তির পক্ষ হতে পারে;

- এই আইনের অধীন সম্পাদিত চুক্তিতে বন অধিদপ্তর ও উপকারভোগী অবশ্যই পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে; এবং
- চুক্তিটি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে স্বাক্ষরিত হবে।

সামাজিক বনায়নে চুক্তির মেয়াদ এবং উহা নবায়নের পদ্ধতি ঃ

- সামাজিক বনায়নে চুক্তির মেয়াদ বিভিন্নরূপ, যেমন-শাল বনের ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ ২০ বৎসর, যা মেয়াদান্তে দুই কিস্তিতে আবর্তকালের মেয়াদ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হবে;
- প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে ২০ বৎসর, যা মেয়াদান্তে এক কিস্তিতে আবর্তকালের মেয়াদ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হবে;
- উডলট, কৃষি বনায়ন, স্ট্রীপ প্লান্টেশন, চরাঞ্চল, বরেন্দ্র এলাকা এবং অন্যান্য এলাকায় বৃক্ষ রোপণের ক্ষেত্রে ১০ বৎসর, যা মেয়াদান্তে তিন কিস্তিতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হবে; এবং
- উল্লেখ্য যে, চুক্তিভূক্ত পক্ষগণের পারস্পরিক সম্মতিতে বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুক্তির মেয়াদ নবায়ন করা যাবে।

ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সামাজিক বনায়ন সম্ভব ঃ

- ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সমাজিক বনায়ন সম্ভব;
- মালিকানাধীন জমিতে সামজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বন অধিদপ্তরের নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদন বিবেচিত হলে বর্ণিত ভূমিতে এই বিধিমালা অনুযায়ী সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে; এবং
- উল্লেখ্য যে, বন অধিদপ্তর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে বিনিয়োগ করলে আবাদী দ্রব্যাদি পারস্পারিক চুক্তির ভিত্তিতে পক্ষদের মধ্যে বন্টিত হবে।

যেভাবে সামাজিক বনায়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটি অংশগ্রহণ করতে পারে ঃ

- ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা
- দল/নেটওয়ার্ক গঠন
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
- সহযোগী ব্যবস্থাপনা।

সামাজিক বনায়ন হতে লব্ধ আয়ের বন্টন বা যেভাবে এই সামাজিক সুরক্ষা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী উপকৃত হতে পারবে ঃ

- বিদ্যমান আইনে যুক্তিসঙ্গত কারণে ছাটাইকরা ডাল-পালা, প্রথম ঘনত্ব কমানোর জন্য (Thining/থিনিং) কাটা গাছ, ফল দানকারী গাছের ফল এবং উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল সম্পূর্ণভাবে উপকারভোগীগণ প্রাপ্য হবে
- তবে প্রথম ঘনত্ব কমানোর পরবর্তী ঘনত্ব কমানোর সময় এবং আবর্তকাল পূর্ণ হবার পর কাটা গাছ হতে প্রাপ্ত আয় পক্ষগণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত হারে বন্টন হবে, যথাঃ-

(ক) বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বন ভূমির উডলট ও কৃষিবনের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	৪৫%
উপকারভোগীগণ	৪৫%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(খ) শালবন ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	৬৫%
উপকারভোগীগণ	২৫%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(গ) বন অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অথবা সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানা বা দখলী স্বত্বাধীন সংকীর্ণ (স্ট্রীপ) ভূমিতে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	১০%
ভূমির মালিকানা বা দখলীস্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা	২০%
উপকারভোগীগণ	৫৫%
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ	৫%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(ঘ) চরভূমি ও ফোরশোর বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	২৫%
উপকারভোগীগণ	৪৫%
ভূমির মালিক বা দখলকার	২০%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(ঙ) বরেন্দ্র এলাকায় খাড়ি ও পুকুর পাড় পুনর্বাসন ও বনায়নের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	২৫%
উপকারভোগীগণ	৪৫%
ভূমির মালিক বা দখলকার	২০%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(চ) শালবন ব্যতীত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	৫০%
উপকারভোগীগণ	৪০%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(ছ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	২৫%
উপকারভোগীগণ	৭৫%

(জ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাষিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	১০%
উপকারভোগীগণ	৭৫%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১৫%

উপকারভোগীদের দায়িত্ব ও সুবিধা হস্তান্তর ঃ

- উপকারভোগী ব্যক্তিগণ সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তাদের দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা ও সুবিধা তাদের স্ত্রী অথবা স্বামী অথবা অন্য যে কোন উত্তরাধিকারীকে হস্তান্তর করতে পারবে।

যেভাবে যৌথব্যবস্থাপনা এবং পার্টনার এসোসিয়েশন এই প্রক্রিয়ায় সাড়া দেবে ঃ

- সামাজিক বনায়নে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে সহায়তা প্রদান;
- সৃষ্ট বনের সুষ্ঠ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- উপকারভোগীগণকে তাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;
- বৃক্ষরোপন তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা;
- চুক্তিভুক্ত পক্ষদের মধ্যে উদ্ভুত বিরোধ নিস্পত্তি; এবং

- বিভিন্ন সময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করাই ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব।

অধিবেশন
৭

	শিরোনাম ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবস্থাপনার ধারণা এবং মৌলিক (Basics) বিষয়সমূহ	

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় জানতে ও বুঝতে পারবেন-

- সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ কি এবং এর ব্যাখ্যা;
- প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস এর বর্ণনা;
- প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ এর পরিচিতি;
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব বলতে কি বুঝায়; এবং
- কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা করবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১.	সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস	পঠন ও আলোচনা	তথ্যপত্র, ফ্লিপশীট ও মার্কার	১৫ মিনিট
২.	প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	তথ্যপত্র, ফ্লিপশীট ও মার্কার,	১৫ মিনিট
৩.	প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপশীট ও মার্কার, মাল্টিমিডিয়া	৩০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস, সংরক্ষণ, গুরুত্ব ও ব্যবস্থাপনা

- এ অধিবেশনটি পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত কবিতার মাধ্যমে শুরু করা যেতে পারে।
- কবিতাটি অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে পাঠ কারানো যেতে পারে।
- কবিতাটি পাঠ শেষে ছোট ছোট প্রশ্ন করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো হতে পারে-
    - ✓ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস বলতে কি বুঝি?
    - ✓ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব কি কি?
    - ✓ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝি?
- প্রয়োজনে সংযোজনীর সহায়তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

- সবশেষে আলোচনার সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে।

সম্পদ ঃ

যা কিছু আমাদের প্রয়োজন বা অভাব মেটাতে পারে তাই সম্পদ যেমন- ঘর-বাড়ি, জমি-জমা, ক্ষেত-খামার, পুকুর ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ

আমাদের চারপাশে প্রকৃতিতে আরও যা কিছু ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে সেগুলো আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমনঃ মাটি, বায়ু, জলাভূমি, গাছপালা, উন্মুক্ত জলাশয়, নদ-নদী, প্রাকৃতিক বন, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক সম্পদগুলো পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে (Occur) যা তুলনামূলকভাবে (Relatively) নির্বিঘ্নে (Udisturbed) টিকে থাকে (Exist) মানবজাতির দ্বারা, প্রাকৃতিক রূপে (Form)। একটি প্রাকৃতিক সম্পদ আবার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় বিভিন্ন প্রতিবেশে যে বিপুল পরিমাণ জীববৈচিত্র্য ও ভূবৈচিত্র্য (Geodiversity) বিদ্যমান আছে তার দ্বারা।

যে কোন প্রাকৃতিক সম্পদ এমনই একটি সম্পদ যা আমরা পরিবেশ হতে সংগ্রহ করে থাকি (Obtain) যেমনঃ পানি, মাটি, উদ্ভিদ, বাতাস, প্রাণী, খনিজ পদার্থ (Minerals), সূর্যের শক্তি (Energy) এবং আরো অনেক কিছু। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ মূল্যবান, কারণ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের অনকেগুলোই মানুষের জীবিকায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Crucial)। আমরাও প্রাকৃতিক সম্পদের একটা অবিচ্ছেদ্য (Integral) অংশ - আমাদের পরিবেশের সাথে আমরাও অবিচ্ছিন্নভাবে (Unbreakably) সংযুক্ত। পানি, বাতাস ও খনিজ পদার্থ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না। কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন পক্ষান্তরে বেশিরভাগ সম্পদ ব্যবহার হয় আমাদের চাহিদা মেটানোর জন্য।

প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস ঃ

প্রথাগতভাবে (Traditionally), প্রাকৃতিক সম্পদগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত (Distinguishes) যথাঃ নবায়নযোগ্য (Renewable) ও অনবায়নযোগ্য (Non-renewable) সম্পদ। তবে, এক অর্থে (In a sense) অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদগুলো নবায়নযোগ্য। সম্পদগুলো পুনঃউৎপাদনে যে সময় নেয় শুধুমাত্র তার উপর ভিত্তি করেই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে পৃথক করা হয়েছে। যেমন প্রতি বছর দশ লক্ষের (Millions) অধিক চিংড়ির পুনঃউৎপাদন সম্ভব পক্ষান্তরে ভূতাত্ত্বিক (Geological) প্রক্রিয়ায় তেলর পুনঃউৎপাদনে প্রয়োজন লক্ষ কোটি (Billions) বছরের অধিক। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদগলোর বিশ্লেষণে (Analysis) সময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (Factor) । বাস্তব উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় বিভিন্ন প্রকার সম্পদের মধ্যে পার্থক্যকরণের জন্য। নিম্নের সম্পদগুলোর প্রকারভেদকে নিয়েই প্রাকৃতিক সম্পদের একটি সাধারণ শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ঃ

- অনবায়নযোগ্য ও অ-পুনঃআবর্তনশীল (Non-recyclable) সম্পদ, যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil fuel) (কয়লা, খনিজ তেল)
- অনবায়নযোগ্য কিন্তু পুনঃআবর্তনশীল সম্পদ, যেমন খনিজ পদার্থ (সোনা, লোহা, তামা (Copper), রুপা (Silver)
- দ্রুত নবায়নযোগ্য সম্পদ, যেমন মাছ
- ধীরগতির (Slowly) নবায়নযোগ্য সম্পদ, যেমন বন
- পরিবেশগত (Environmental) সম্পদ, যেমন বায়ু, পানি ও মাটি
- প্রবাহিত (Flow) সম্পদ, যেমন সৌর (Solar) ও বাতাস (Wind) এর শক্তি

ভূমি (Land), মহাজাগতিক সকল বস্তুর আধার (Space) এর অর্থে (In the sense), অনেক সময় সম্পদ হিসাবে ধরা হয় প্রকৃতিগতভাবে (In itself), যেহেতু মানুষের সকল কর্মকান্ডের জন্য মহাজাগতিক আধার পূর্বাবশ্যক (Prerequisite)। অধিকাংশ জৈবিক (Biological) সম্পদগুলোর বজায়/অব্যাহত রাখার (Sustain) জন্য প্রয়োজন হয় ভূমির, উদাহরণস্বরূপ, জীববৈচিত্র্য ও লেন্ডস্কেপ সংরক্ষণ।

অনবায়নযোগ্য সম্পদগুলো উত্তোলন করার (Extract) কারণে শেষ পর্যন্ত (In the long run) সেগুলো শেষ হয়ে যাবে (Deplete)। নবায়নযোগ্য সম্পদগুলোও শেষ হয়ে যাবে যদি উত্তোলন করার হার (Rate) নবায়নযোগ্য হার থেকে বেশী হয়। একটি নবায়নযোগ্য সম্পদ বজায়/অব্যাহত রাখার (Sustain) জন্য, খরচ করার (Consumption) হার প্রাকৃতিক পদ্ধতির নবায়নযোগ্য ধারণক্ষমতার (Capacity) মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

কিছু অনবায়নযোগ্য সম্পদ যেমন খনিজ পদার্থগুলো (সোনা, লোহা, তামা (Copper), রুপা (Silver)) হয় পুনঃআবর্তনশীল (Recyclable) পক্ষান্তরে অন্যান্যগুলো, যেমন জীবাশ্ম জ্বালানিগুলো (কয়লা, খনিজ তেল) পুনঃআবর্তনশীল নয়। শূণ্যীকরণের (Depletion) ক্ষেত্রে এই পার্থক্য প্রাসঙ্গিক (Relevant)।

চিত্রঃ ফুলবাড়ি কয়লা খনি, বাংলাদেশ

প্রবাহিত সম্পদগুলো, যেমন সৌর ও বাতাস এর শক্তি, এমন সম্পদ যেগুলোর প্রায় স্থায়ী (Permanent) বৈশিষ্ট্য আছে। সৌর শক্তি প্রায় স্থির/অপরিবর্তনীয় (Constant) ও লক্ষ কোটি বছর ধরে এর অস্তিত্ব (Exist) চলমান। ভূ-পৃষ্ঠের তাপ (Geothermal) শক্তিকেও, তার প্রাচুর্যের (Abundance) কারণে, প্রবাহিত সম্পদ হিসেবে ধরা হয়।

পরিবেশগত সম্পদ যেমন বায়ু, পানি ও মাটিরও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য আছে এই অর্থে যে এগুলো ধ্বংস (Destroyed) হতে পারে না। তবে, দূষণ দ্বারা এই সম্পদগুলোর অবক্ষয় (Degraded) হতে পারে এবং যা পরবর্তীতে মানুষের কল্যাণে কোন কাজে আসেনা।

প্রাকৃতিক সম্পদ প্রসঙ্গ (Issue) ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদগুলো মানুষের অস্তিত্ব (Existence) ও কার্যকলাপ (Activities) এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল মূল উপদানসমূহ (Basis) সরবরাহ করে। প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মৌলিক (Basic) কাজগুলো (Functions) দুইটি প্রধানভাগে বিভক্ত। প্রথমত, প্রাকৃতিক সম্পদগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা (Raw) উপদানসমূহ (Materials) সরবরাহ করে পণ্যের উৎপাদন ও সেবাসমূহে উপরন্তু (As well as) পরিবেশগত বিভিন্ন সেবায়। প্রায়ই এটাকে কাজের উৎস হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

তদুপরি, প্রাকৃতিক সম্পদগুলো অথবা পরিবেশের কাজগুলো (Environment functions) বর্জ্য (Waste) গ্রহণের (Receiving) মাধ্যম (Medium) হতে পারে যা উৎপন্ন (Originating) হয় পণ্যের উৎপাদন ও খরচ করার (Consumption) সময় - বর্জ্যগুলো প্রকৃতিতে আত্তীকৃত (Assimilated) অথবা পুঞ্জীভূত (Accumulated) হয়। প্রায়ই এটাকে কাজের আধার (Sink function) বলা হয়।

যদি প্রাকৃতিক সম্পদগুলো শূণ্য বা অবক্ষয় হয়ে যায়, তবে এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (Physical) ও পরিবেশগত সেবাসমূহ হ্রাস (Diminish) পাবে এবং যার ফল ভোগ করবে নিম্ন পর্যায়ের ভোগকারীরা। যখন সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করা হয়, তখন দুইটি প্রভাব গুরুত্বপূর্ণঃ

- **সম্পদের শূন্যীকরণ (Depletion) ঃ** প্রথমত এটা অনবায়নযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক, যেখানে শূন্যীকরণের ফলে মোট মজুদ হ্রাস পাবে, এবং নবায়নযোগ্য সম্পদের অতিরিক্ত আহরণের ফলে এই শূন্যীকরণ ঘটবে।

- **সম্পদের অবক্ষয় ঃ** বর্জ্য অথবা পণ্যের ব্যবহার ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর অবক্ষয় হয়। ফলে, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত সেবাগুলো হ্রাস পায়।

পরিবেশগত সম্পদগুলোর অবক্ষয়ে আজকের জনগোষ্ঠীর (Societal) উদ্বেগ (Concern) বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের ভোগ (Consumption) ও জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির কারণে, এই সম্পদগুলোর ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিবেশগত সম্পদগুলোর অবক্ষয় মানবজাতির জন্য বড় ধরনের হুমকি হিসাবে দেখা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এই উদ্বেগগুলো হচ্ছে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি ও জীবন রক্ষাকারী প্রতিবেশসমূহের সম্ভাব্য হানি/বৈকল্য (Impairment)।

মানবজাতি পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়েছে সময়ের সূচনা (Dawn) থেকে এবং আমাদের বর্তমান সম্পদ (Weatlh) এর জন্য মূল (Original) প্রকৃতির অধিকাংশ পরিবর্তন হয়েছে উৎপাদনশীল (Productive) সম্পদে (Assets), উদাহরণস্বরূপ বনগুলোর কৃষিভূমিতে পরিবর্তন। তাই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন উৎপন্নদ্রব্য (Products) ও পণ্যদ্রব্য (Goods) তৈরীর মাধ্যমে যা মানুষের অসাধারণ কল্যাণ বয়ে এনেছে, যদিও এই অর্জনগুলোর (Gains) বণ্টন (Distribution) দেশেগুলোর মধ্যে ন্যায্যভাবে (Fairly) অসম (Unequal) ও ব্যাপক বৈষম্যের (Disparities)।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ মানে একটি পদক্ষেপ যার ফলে এমনভাবে সম্পদ ব্যবহার হবে যাতে অতিরিক্ত আহরণ না হয়। এর লক্ষ্য হচ্ছে সম্পদকে যতটুকু সম্ভব ভাল পর্যায়ে অক্ষুন্ন রাখা (Maintain)। অর্থাৎ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাই হলো প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা বা সংরক্ষণ।

সুরক্ষিত এলাকাসমূহ যেমন ঃ জাতীয় পার্ক, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য, ইকোপার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা, মৎস্য অভয়ারণ্য, হাওড়, বাওড়, বিল, নদী ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব ঃ

- প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য
- পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য
- প্রাকৃতিক দুযোর্গ এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
- বিনোদনের জন্য
- মৎস্য সম্পদ এর নিরাপদ বিচরণ ক্ষেত্র নিশ্চিত করার জন্য

- বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ বিচরণ ক্ষেত্র নিশ্চিত করার জন্য

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ঃ

আমাদের খুব সচেতন হতে হবে কিভাবে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে ব্যবহার করবো আমাদের পরিবেশে। আমরা অবশ্যই সম্পদগুলো ব্যবহার করবো এইভাবে যেন সম্পদগুলোর সরবরাহ বিপদজনকভাবে হ্রাস না পায় এবং পরিবেশের বিভিন্ন সম্পদ ও জীবের মধ্যকার ভারসাম্য আমরা অবশ্যই রক্ষা করবো।

- **স্বাস্থ্যকর প্রতিবেশ অক্ষুণ্ন রাখা (Manitaining) ঃ** সকল উদ্ভিদ, প্রাণী ও জড় বস্তু একে অপরের উপর ক্রিয়া করে (Interact) এবং সহ-অবস্থান (Co-exist) করে ভারসাম্য রক্ষা করে। এই ভারসাম্য নষ্ট করলে সমগ্র (Entire) প্রতিবেশের সকল ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এই প্রভাবগুলো থেকে আমরা মুক্ত (Immune) নই। দীর্ঘজীবি ও স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য আমাদের অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এই ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

- **টেকসই জীবিকায়ন গঠন ঃ** কৃষকরা তাদের জীবিকায়নের জন্য সমগ্র প্রতিবেশ (পানি, মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং এর মধ্যে যা কিছু থাকে) এর উপর নির্ভর করে। তারা কতটুকু সফল তাদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল পরিবারগুলোর ভরণপোষণে, তা নির্ভর করে তারা কতটা ভালভাবে সম্পদগুলো ব্যবস্থাপনা করছে। ভাল ব্যবস্থাপনার অনুশীলন (Practices) কৃষকদের নিরাপত্তাবিধান (Safeguard) ও জীবিকায়ন উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রাকৃতিক সম্পদগুলো যেমন ভূমি, পানি, মাটি, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ব্যবস্থাপনার একটি শৃঙ্খলা (Discipline), একটি নির্দিষ্ট নিবদ্ধ (Focus) থাকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় প্রজন্মের উপর কিভাবে ব্যবস্থাপনা জীবন মান (Quality of life) এ প্রভাব ফেলে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা সনাক্ত করে কার অধিকার আছে সম্পদগুলো ব্যবহারের এবং সম্পদের সীমা নির্ধারণে কার অধিকার নাই। ব্যবহারকারীদের দ্বারা সম্পদগুলোর ব্যবস্থাপনা হয় যা বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে কখন ও কিভাবে সম্পদ ব্যবহার হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর সফল ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই জনসম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ থাকবে কারণ প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টনে যে ব্যক্তিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিধি দ্বারা তারা যেন অংশগ্রহণ করতে পারে অংশীদার নির্বাচন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। ব্যবহারকারীদের অধিকার থাকবে তাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা যা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত তার বাস্তবায়নে। সম্পদগুলোর অধিকার যার অন্তর্ভূক্ত ভূমি, পানি, মৎস্যসম্পদ এবং চারণভূমির (Pastoral) অধিকার। ব্যবহারকারী বা দলগুলো দায়ী থাকবে তাদের কাছে যারা বিধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সঠিকভাবে পরিবীক্ষণ ও সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং যারা বিধি ভঙ্গ করে তাদের ক্ষতিপুরণ করে। এই দ্বন্দ্বগুলো দ্রুত ও কম খরচে নিরসন করা হয় স্থানীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা অপরাধের মাত্রা ও পরিস্থিতি অনুসারে।

সহ-ব্যবস্থাপনা ঃ

- বাংলাদেশ বন বিভাগ জন্মলগ্ন থেকেই বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে নিয়োজিত। বস্তুতঃপক্ষে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বন ও বনজ সম্পদ এর সুষ্ঠ ব্যবহার ও সরকারী রাজস্ব আহরণ বন ব্যবস্থাপনার মূখ্য উদ্দেশ্য। তবে কালের প্রবাহে এটা প্রতীয়মান যে, বন বিভাগ এর পক্ষে একা একা এই সম্পদ রক্ষা বা ব্যবস্থাপনার কাজটি শুধুমাত্র কঠিনই নয় দুঃসাধ্যও বটে। এর কারণ বন বিভাগ এর সামর্থ্য ও সম্পদ এর সীমাবদ্ধতা। এ ছাড়াও বিশ্বের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় জনগণের সহায়তা ও অংশগ্রহণ ছাড়া শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়।

- এ কারণে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে এবং এই অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হবে Equitable Benefit Sharing অর্থাৎ সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার এর সুষম বন্টন। অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।

- *বাংলাদেশ সরকার প্রজ্ঞাপনের (পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮, তারিখ ২৩/১১/২০০৯) মাধ্যমে বিভিন্ন রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও কমিটি গঠনের অনুমোদন প্রদান করেছেন।*

অধিবেশন
৮

	শিরোনাম ঃ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (বন ও জলাভূমি) এর প্রকারভেদ ও সংক্ষিপ্তসার (Profile)	

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল ও রক্ষিত এলাকাসমূহের পরিচিতি লাভ করবেন;
- পরিবেশগত ভাবে বাংলাদেশের বনের শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের জলাভূমি সম্পদের ধারণা পাবেন; এবং
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১.	বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল ও রক্ষিত এলাকাসমূহ	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপশীট ও মার্কার	১০ মিনিট
২.	পরিবেশগত ভাবে বাংলাদেশের বনের শ্রেণীবিভাগ	আলোচনা	তথ্যপত্র, ফ্লিপশীট ও মার্কার	১৫ মিনিট
৩.	বাংলাদেশের জলাভূমি সম্পদ	আলোচনা ও দলীয় কাজ	ফ্লিপশীট ও মার্কার	২৫ মিনিট
৪.	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ	আলোচনা	তথ্যপত্র, ফ্লিপশীট ও মার্কার	১০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল ও রক্ষিত এলাকাসমূহ

- অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার সাথে বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল ও রক্ষিত এলাকাসমূহের যোগসূত্র স্থাপন করে দুর্যোগের ধরনগুলোর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

পরিবেশগত ভাবে বাংলাদেশের বনের শ্রেণীবিভাগ

- ৪ দলে ভাগ করে ফিপ্লা শীটে লিখতে দিয়ে কাজটি করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে আলোচনা করে লেখার জন্য সময় দেয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময় শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করা যেতে পারে। অথবা
- ঝোড়ো ভাবনা বা আলোচনা পদ্ধতির সহায়তায় সম্পূর্ণ বিষয়টি আলোচনা করে তা জানা যেতে পারে।

বাংলাদেশের জলাভূমি সম্পদ

- বাংলাদেশের জলাভূমি সম্পদ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য মনোমানচিত্র ও ডট মেট্রিকস এর মাধ্যমে আলোচনাটি পরিচালনা করা যেতে পারে।
- এক্ষেত্রে ২/৩টি জোড়া দেয়া ফিপ্লাশীট/ব্রাউন পেপারটি ভিপবোর্ড বা প্রশিক্ষণ কক্ষের একটি দেয়ালে লাগিয়ে দেয়া যেতে পারে, লাগানো ফিপ্লাশীট/ব্রাউন পেপারের মাঝখানে বৃত্তাকার ভিপ/কাগজে আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম লিখে লাগিয়ে দেয়া যেতে পারে।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের ৩ মিনিট সময় দিয়ে বাংলাদেশের জলাভূমি সম্পদসমূহের মধ্যে কোন সম্পদগুলো গুরুত্বপূর্ণ তা তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যেককে কমপক্ষে ৩টি পয়েন্ট খাতায় লিখে রাখতে বলা যেতে পারে।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলা এবং তাঁদের বলা পয়েন্টগুলো ফিপ্লাশীট/ব্রাউন পেপারের মাঝখানে লাগানো শিরোনাম লেখা বৃত্তাকার কার্ড/কাগজকে কেন্দ্র করে পোস্টার/ব্রাউন পেপারের চারদিকে লিখে রাখা যেতে পারে। লেখার সময় বিভিন্ন রংয়ের মার্কার ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে করে মনোমানচিত্রকে সূর্য্যরশ্মির আলো বিচ্ছুরণের মতো মনে হতে পারে।
- লেখার পর প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে দিয়ে ৭টি ডট/ভোটের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার অগ্রাধিকার নির্ণয় করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকে একটি অভিজ্ঞতায় সর্বোচ্চ ৩টি ভোট/ডট লাগানোর সুযোগ দেয়া যেতে পারে। ভোট/ডট লাগানোর পর তা গণনা করে অভিজ্ঞতার অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ

- অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার সাথে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহের যোগসূত্র স্থাপন করে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

- সবশেষে আলোচনার সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল ও রক্ষিত এলাকাসমূহ ঃ

বনভূমি ঃ

আমাদের চারপাশে প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট নানা প্রজাতির ছোট বড় বৃক্ষ অধ্যুষিত যে সমস্ত ভূমি রয়েছে সেগুলোই আমাদের বনভূমি।

বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

অবস্থান	ঃ ২০° ৩৪´ হতে ২৬° ৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ০১´ হতে ৯২° ৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।
আয়তন	ঃ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃমিঃ।
জনসংখ্যা	ঃ ১৪ কোটি ৬৬ লক্ষ (BBS, 2010)।
ঘনত্ব	ঃ ৯১৮ প্রতি বর্গ/কিঃমিঃ।
টার্শিয়ারি (তৃতীয় স্তরীয়) পাহাড়	ঃ ১২%।
তাপমাত্রা	ঃ ৭.২২-১২.৭৯°C হতে ২৩.৮৮-৩১.৭৭°C (শীতকালে) ৩৬.৬৬°C হতে ৪০.৫০°C (গ্রীষ্মকালে)
বৃষ্টিপাত	ঃ ১২২৯ হতে ৪৩৩৮ মিঃমিঃ (WARPO, 2000)

এক নজরে বাংলাদেশের বন ঃ

- জমির পরিমাণ ১৪.৭৫৭ মিলিয়ন হেক্টর;
- জিডিপি-তে বনের অবদান ২.১ ভাগ;
- দেশের মোট ভূ-ভাগের প্রায় ১৭.০৭ ভাগ বনভূমি যার মধ্যে ১.৬৬৭ ভাগ রক্ষিত এলাকা;
- মাথা পিছু বনের পরিমাণ ০.০২ হেক্টর;
- প্রধান বন প্রকৃতিঃ পাহাড়ি বন, শাল বন, ম্যানগ্রোভ বন এবং গ্রামভুক্ত বন।

ছক-৩ক ঃ বাংলাদেশের বনভূমি

বনের প্রকৃতি	আয়তন (মিলিয়ন হেক্টর)	দেশের মোট ভূ-ভাগের তুলনায় শতকরা পরিমাণ
বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বন	১.৫২	১০.৩০০%
অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বন (পাহাড়ি বন)	০.৭৩	৪.৯৪৭%
গ্রামভূক্ত বন	০.২৭	১.৮৩০%
মোট	**২.৫২**	**১৭.০৭৭%**

ছক-৩খ ঃ বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বন

বনের প্রকৃতি	আয়তন (মিলিয়ন হেক্টর)	মোট ভূ-ভাগের তুলনায় শতকরা পরিমাণ
পাহাড়ি বন	০.৬৭	৪.৫৪০%
প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	০.৬০	৪.০৬৬%
বনায়নকৃত ম্যানগ্রোভ বন	০.১৩	০.৮৮১%
শাল বন	০.১২	০.৮১৩%
মোট	১.৫২	১০.৩০০%

উৎসঃ বন বিভাগ।

মোট বন ভূমির, ৮৪ ভাগ প্রাকৃতিক বন এবং ১৬ ভাগ বনায়নকৃত বন (NFA 2005-2007)।

ছক-৩গ ঃ বাংলাদেশের বন প্রকৃতি

বনের প্রকৃতি	আয়তন (লক্ষ একর)	আয়তন (মি. হেক্টর)	উদ্ভিদ আচ্ছাদিত অঞ্চল		উদ্ভিদ আচ্ছাদিত অঞ্চল (%)
			আয়তন (লক্ষ একর)	আয়তন (মি. হেক্টর)	
পাহাড়ি বন	৩৪.৫৭	১.৪০	৮.১৫	০.৩৩	২.৩
ম্যানগ্রোভ বন	১৮.২৭	০.৭৪	১১.৩৬	০.৪৬	৩.২
শাল বন	২.৯৬	০.১২	১.২৩	০.০৫	০.৩
গ্রামভুক্ত বন	৬.৬৭	০.২৭	৬.৬৭	০.২৭	১.৯

ছক-৩ঘ ঃ বনভূমির আয়তন (আইনগত ভাবে)

ক্রমিক নং	বন ভূমির প্রকৃতি	আয়তন (হেক্টর)
১	সংরক্ষিত বন	১২২২৬৯১.৪৪১
২	বন আইন ১৯২৭ এর ধারা ৪ এবং/অথবা ৬ এর আওতায় প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে সংরক্ষিত বন	৫৮৯৯৪৭.৯৬
৩	রক্ষিত বন	৩৬৯৯৬.৭১
৪	অর্জিত বন	৮৪৪৫.২১
৫	অর্পিত বন	৩৮৪২.৯
৬	অশ্রেণীভূক্ত বন যা বন বিভাগের আওতাধীন	১৭৩৪৭.১৮

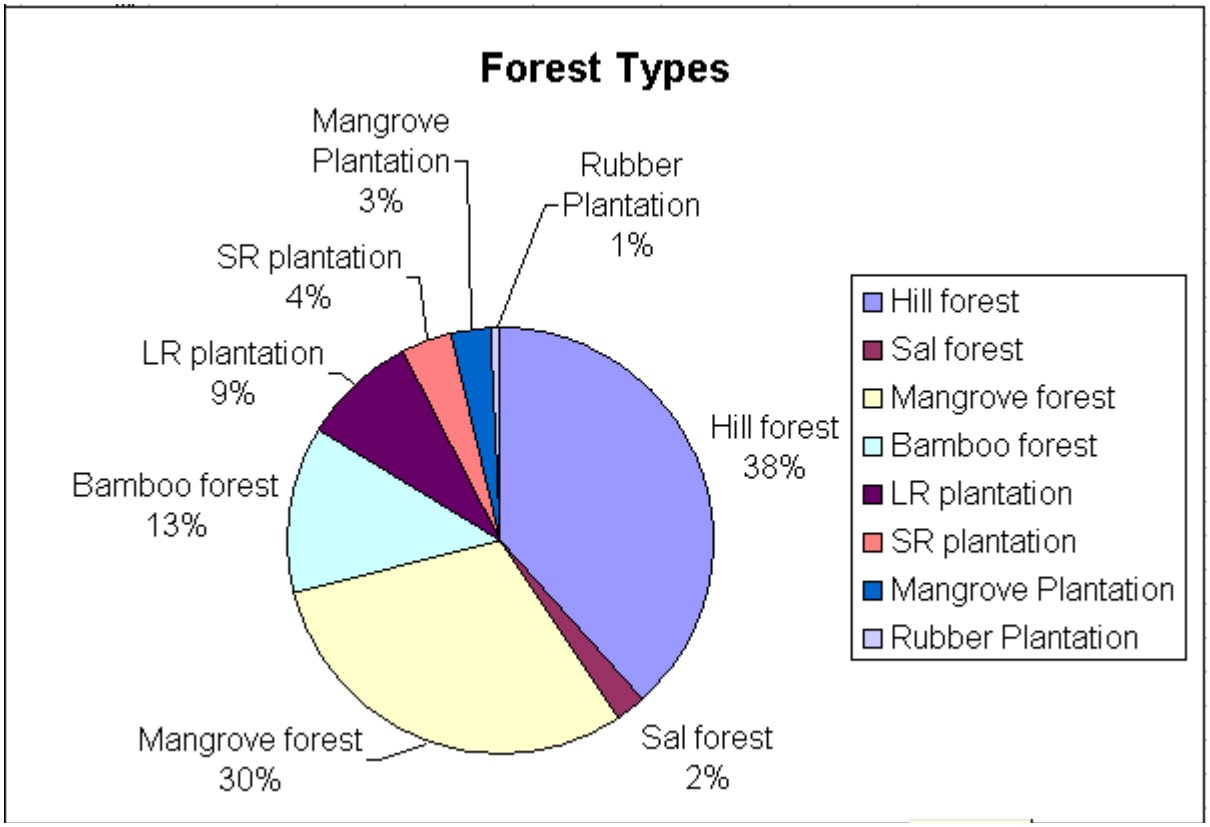

পরিবেশগত ভাবে বাংলাদেশের বনকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. **গ্রীষ্মমন্ডলীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন (Tropical Wet Evergreen Forest)ঃ** সিলেটের পাহাড়ি বন এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অঞ্চল এ বনের অন্তর্ভূক্ত। এই বনের প্রধান প্রজাতি সমূহ হচ্ছে *Artocarpus chaplasha* (চাপালিশ), *Syzygium spp* (জাম), *Hopea odorata* (তেলসুর) এবং *Dipterocarpus spp* (গর্জন) ইত্যাদি।

২. **গ্রীষ্মমন্ডলীয় অর্ধ-চিরসবুজ বন (Tropical Semi-Evergreen Forest)ঃ** চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশির ভাগ পাহাড়ি বন এ বনের অন্তর্ভূক্ত। এই বনের প্রধান প্রজাতি সমূহ হচ্ছে *Dipterocarpus spp* (গর্জন), *Swintonia floribunda* (সিভিট), *Albizzia spp* (করই) ইত্যাদি।

৩. **গ্রীষ্মমন্ডলীয় আর্দ্র পর্ণমোচীবন/শালবন (Tropical Moist Deciduous Forest)ঃ** বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ইত্যাদি জেলার শাল বন এ বনের অন্তর্ভূক্ত। এ বনের প্রধান প্রজাতি হচ্ছে *Shorea robusta* (শাল)।

৪. **স্বাদু পানির জলজ বন (Fresh Water Wetland Forests)ঃ** হাওর বেসিন ও জলাভূমির সমন্বয়ে এই বন। এই বনের প্রধান প্রজাতি সমূহ হচ্ছে *Barringtonia acutangula* (হিজল), *Pongamia pinnata* (করজ) ইত্যাদি।

৫. **ম্যানগ্রোভ বন (Mangrove Forest)ঃ** সমগ্র উপকূলীয় বন ও সুন্দরবন এই বনের অন্তর্ভূক্ত। প্রধান প্রজাতি সমূহ হচ্ছে *Heritiera fomes* (সুন্দরী), *Sonneratia apetala* (কেওড়া), *Excoecaria agallocha* (গেওয়া), *Ceriops decandra* (গড়ান) ইত্যাদি।

পাহাড়ি বনাঞ্চল ঃ

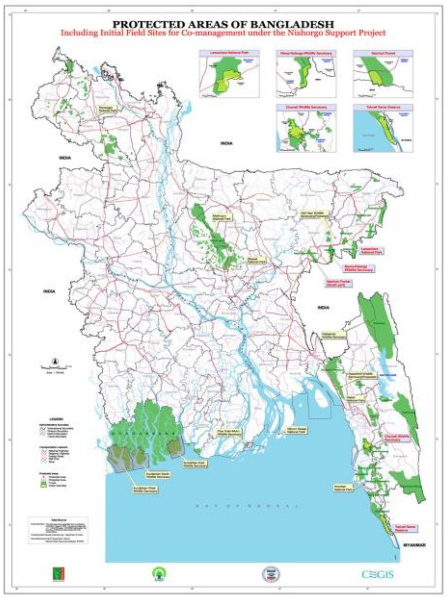

বাংলাদেশের পাহাড়ি বনাঞ্চলের সর্বমোট আয়তন ১৬,৫৪,৩২১ একর। এটি বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.৭ শতাংশ এবং বন বিভাগের আওতাধীন বনাঞ্চলের ৪৪ শতাংশ। বাংলাদেশের পাহাড়ি বনাঞ্চল রয়েছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে।

ম্যানগ্রোভ বন ঃ

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভূমি ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ম্যানগ্রোভ বনকে গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিরসবুজ বন (Tropical Evergreen Forest) হিসাবে গণ্য করা হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনসমূহের মধ্যে সুন্দরবন সবচেয়ে বড় ও অনন্য। সুন্দরবনে রয়েছে তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য যেগুলোকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ জোনের অন্তর্গত করা হয়েছে। এ তিনটি অভয়ারণ্য হলো- পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, দক্ষিণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। এছাড়া এ বনাঞ্চলের উত্তর সংলগ্ন দিকে প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকাও (ECA) রয়েছে। যার আয়তন ৭,৬২,০৩৪ হেক্টর।

- সুন্দরবনের মোট আয়তন ১৪,৮৫,৬৭৯ একর যা বাংলাদেশের আয়তনের ৪.২ শতাংশ এবং বাংলাদেশ বন বিভাগের আওতাধীন বনাঞ্চলসমূহের ৪০ শতাংশ। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ ও ২৬৯ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল হিসাবে সুন্দরবন বিশ্বব্যাপী পরিচিত।
- ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের আওতায় রয়েছে সুন্দরবনের ৩,৪৪,৯৩৮ একর বনভূমি।

শালবন ঃ

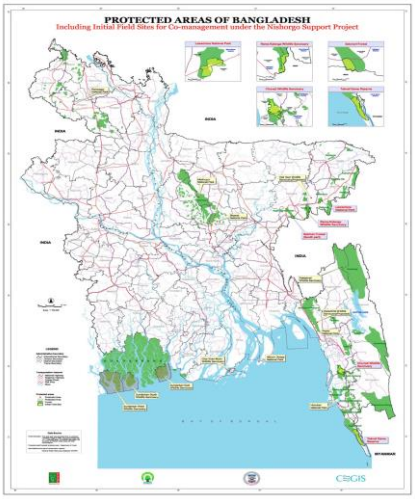

- একসময় বাংলাদেশে মধ্য ও উত্তরভাগ জুড়ে এ বন বিস্তৃত ছিল।
- এখন এ বন রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায়, লোকবসতির সাথে মিশ্রিতভাবে। শালবন গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং কিছু সিলেট, নওগাঁ, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় রয়েছে।
- শালবন বাংলাদেশের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বন। এর আয়তন ২,৯৬,২৯৬ একর, যা দেশের ভূ-খন্ডের ০.৪% ও বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনাঞ্চলের ৭.৯%।

রক্ষিত এলাকা/বন ঃ

"রক্ষিত এলাকা" অর্থ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর চতুর্থ অধ্যায়ের ধারা ১৩, ১৭, ১৮ ও ১৯ অনুসারে সরকার ঘোষিত সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান ও পঞ্চম অধ্যায়ের ধারা ২২ অনুসারে গঠিত বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং ধারা ২৩ অনুসারে গঠিত জাতীয় ঐতিহ্য ও কুঞ্জবন।

রক্ষিত এলাকাগুলি হচ্ছে ঐসকল স্থান যেখানকার স্বীকৃত প্রাকৃতিক, প্রতিবেশগত এবং/অথবা সাংস্কৃতিক মূল্য সংরক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের রক্ষিত এলাকা রয়েছে, যেগুলি সংরক্ষণের ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন হয় যা প্রতিটি দেশের আইন অথবা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর নিয়ম কানুনের উপর নির্ভরশীল।

আইনের দৃষ্টি কোন হতে বাংলাদেশের রক্ষিত বন বলতে বুঝায় এ ধরনের বনে নিষিদ্ধ কার্যক্রম ব্যতীত সকল ধরনের কার্যক্রম করা সম্ভব। বাংলাদেশে রক্ষিত এলাকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'জাতীয় উদ্যান' ও 'বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য'। নিম্নে বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকার তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

ছক-৪ঃ রক্ষিত এলাকাসমূহের তালিকা

ক. জাতীয় উদ্যান	বনের প্রকৃতি	আয়তন (হেক্টর)	জেলা	প্রতিষ্ঠাকাল
১. ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	শালবন	৫,০৫৫	গাজীপুর	১৯৭৪/১৯৮২
২. মধুপুর জাতীয় উদ্যান	শালবন	৪,৩৩৬	টাঙ্গাইল	১৯৬২/১৯৮২
৩. রামসাগর জাতীয় উদ্যান	শালবন	২৪	দিনাজপুর	২০০১
৪. হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	১,৭২৯	কক্সবাজার	১৯৮০
৫. লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	১,২৫০	মৌলভীবাজার	১৯৯৬
৬. কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	৫,৪৬৪	রাঙ্গামাটি	১৯৯৯
৭. নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	১৬,৩৪২	নোয়াখালি	২০০১
৮. মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	৩৯৫	কক্সবাজার	২০০৪
৯. সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	২৪০	হবিগঞ্জ	২০০৫
১০. খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	৬৭৯	সিলেট	২০০৬
১১. বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি বন	২,৯৩৪	চট্টগ্রাম	২০১০
১২. কাদিগড় জাতীয় উদ্যান	শালবন	৩৪৪	ময়মনসিংহ	২০১০
১৩. সিংড়া জাতীয় উদ্যান	শালবন	৩০৬	দিনাজপুর	২০১০
১৪. নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	শালবন	৫১৮	দিনাজপুর	২০১০

১৫. কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	১৬১৩	পটুয়াখালী	২০১০
১৬. আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান	শালবন	২৬৪.১২	নওগাঁ	২০১১
১৭. বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	শালবন	১৬৮.৫৬	দিনাজপুর	২০১১
খ. বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	**বনের প্রকৃতি**	**আয়তন (হেঃ)**	**জেলা**	**প্রতিষ্ঠাকাল**
১৮. রেমা-কালেঙ্গা	পাহাড়ি বন	১,৭৯৬	হবিগঞ্জ	১৯৯৬
১৯. চর কুকরি-মুকরি	উপকূলীয় মানগ্রোভ	৪০	ভোলা	১৯৮১
২০. সুন্দরবন (পূর্ব)	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৩১,২২৭	বাগেরহাট	১৯৬০/১৯৯৬
২১. সুন্দরবন (পশ্চিম)	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৭১,৫০২	সাতক্ষীরা	১৯৯৬
২২. সুন্দরবন (দক্ষিণ)	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৩৫,৯৭০	খুলনা	১৯৯৬
২৩. পাবলাখালী	পাহাড়ি বন	৪২,০৮৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৯৬২/১৯৮৩
২৪. চুনতি	পাহাড়ি বন	৭,৭৬১	চট্টগ্রাম	১৯৮৬
২৫. টেকনাফ	পাহাড়ি বন	১১,৬১৫	কক্সবাজার	২০১০
২৬. ফাঁসিয়াখালী	পাহাড়ি বন	৩,২১৭	কক্সবাজার	২০০৭
২৭. হাজারীখিল	পাহাড়ি বন	১,১৭৮	চট্টগ্রাম	২০১০
২৮. দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি	পাহাড়ি বন	৪,৭১৭	চট্টগ্রাম	২০১০
২৯. সাংগু	পাহাড়ি বন	২,৩৩২	বান্দরবন	২০১০
৩০. টেংরাগিরি	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৪,০৪৯	বরগুনা	২০১০
৩১. সোনারচর	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	২,০২৬.৪৮	পটুয়াখালী	২০১১
৩২. চান্দপাই	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৫৬০	বাগেরহাট	২০১২
৩৩. দুদমুখী	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	১৭০	বাগেরহাট	২০১২
৩৪. দাঙ্গমারি	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ	৩৪০	বাগেরহাট	২০১২

কোন বনাঞ্চলকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা বনজ সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, কিন্তু কেবলমাত্র এই উদ্যোগ গ্রহণই যথেষ্ট নয়।

কোন বনাঞ্চলকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার পর সেটির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদিকেও অতীব গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, আমাদের সে দিকে নজর দিতে হবে এবং রক্ষিত এলাকা যাতে প্রকৃত রক্ষিত এলাকা থাকে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।

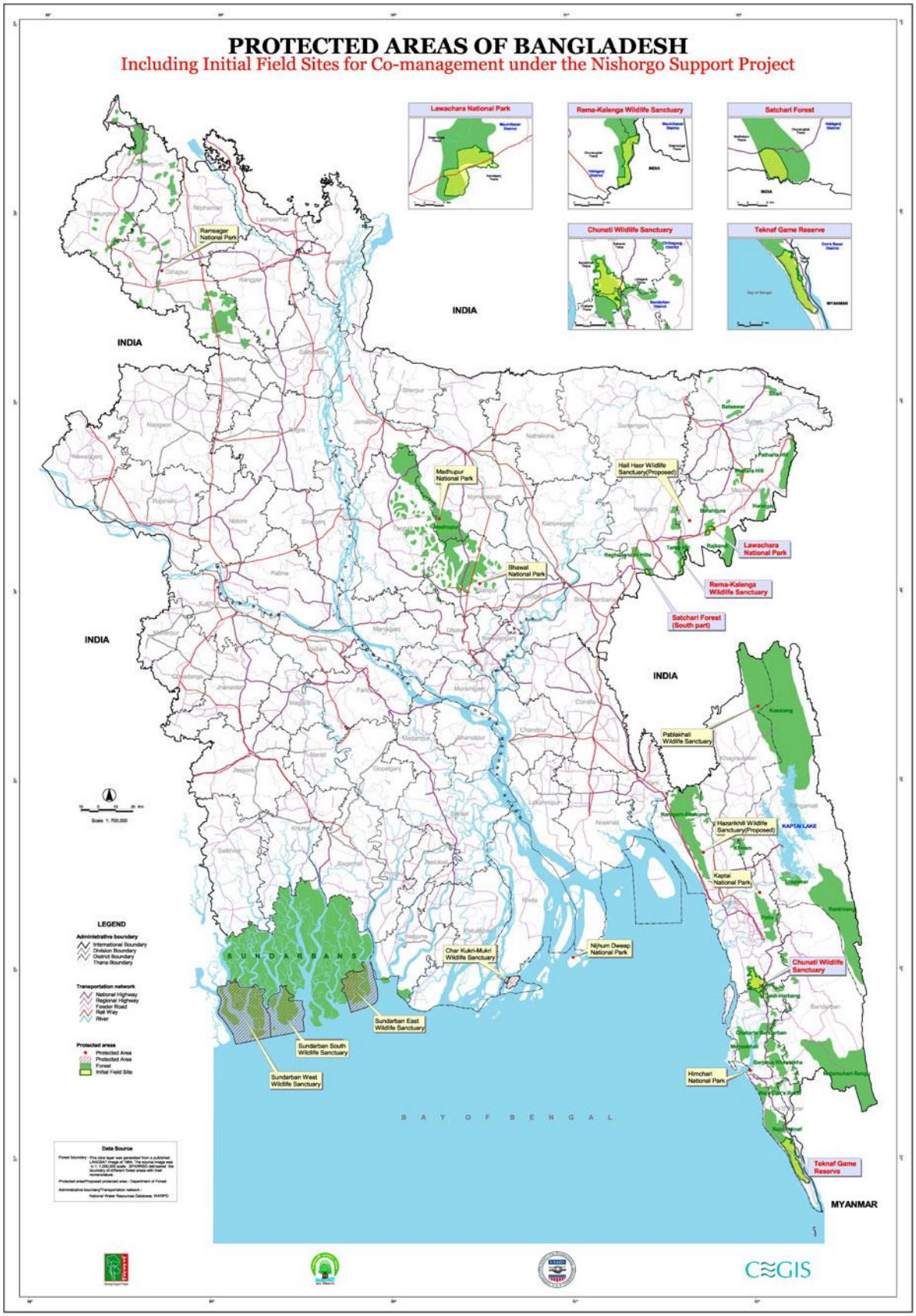

PROTECTED AREAS OF BANGLADESH

Including Initial Field Sites for Co-management under the Nishorgo Support Project

জলাভূমি ঃ

জলাভূমি (Wetland) অবনমিত প্রতিবেশ ব্যবস্থা যেখানে পানির স্তর সবসময়ই ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বা প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করে। জলাভূমি বলতে বোঝায় জলা (Marsh or Fen), ডোবা (Bog), প্লাবনভূমি (Floodplain) এবং অগভীর উপকূলীয় এলাকাসমূহকে। ধীর গতিপ্রবাহ অথবা স্থির পানি দ্বারা জলাভূমি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং এই পানিরাশি বন্য জলজ প্রাণিজগতের জন্য একটি মুক্ত আবাসস্থল। রামসার (Ramsar) কনভেনশন-১৯৭১ অনুযায়ী জলাভূমির সংজ্ঞা হচ্ছে- "প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট, স্থায়ী অথবা অস্থায়ী, স্থির অথবা প্রবাহমান পানিরাশি বিশিষ্ট স্বাদু, লবণাক্ত অথবা মিশ্র পানিবিশিষ্ট জলা, ডোবা, পিটভূমি অথবা পানিসমৃদ্ধ এলাকা এবং সেইসঙ্গে এমন গভীরতাবিশিষ্ট সামুদ্রিক এলাকা যা নিম্ন জোয়ারের সময় ৬ মিটারের বেশি গভীরতা অতিক্রম করে না" (Wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres)।

বাংলাদেশের জলাভূমি সম্পদ ঃ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাভূমি সম্পদ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুকুর-দীঘি, ডোবা-নালা, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিশাল হাওর এলাকা যা আমাদের মৎস্যসম্পদের সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

হাওর ঃ

হাওর হচ্ছে বিশাল পিরিচাকৃতির (Saucer-shaped) এক নিম্ন-প্লাবনভূমি অঞ্চল। হাওরের অন্যতম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হলো দেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্লাবনভূমির তুলনায় এ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিচু ও ব্যাপক বিস্তৃত। সাধারণত দু'টি বৃহৎ নদীর অন্তর্বর্তী উপত্যকা অঞ্চলটিই হাওর। বর্ষাকালে হাওরের পানিরাশির ব্যাপ্তি থাকে অনেক বেশি, আর শীতকালে সংকুচিত হয়ে পড়ে। প্রধানত বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে হাওর দেখা যায়। এই হাওরগুলো নদী ও খালের মাধ্যমে জলপ্রবাহ পেয়ে থাকে।

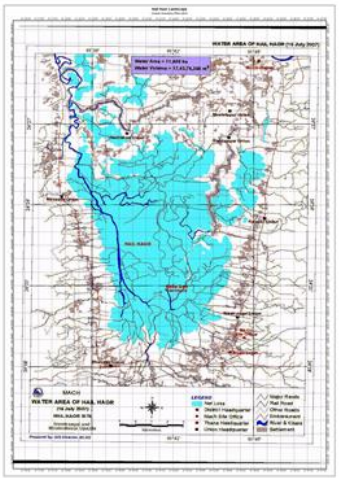

চিত্রঃ হাইল হাওর।

বাঁওড় ঃ

প্রাকৃতিক বা অন্য কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পূর্ব গতিপথের স্রোত প্রাকৃতিক কারণে বন্ধ হয়ে যে বিস্তীর্ণ জলাভূমি সৃষ্টি করে তাকে বাঁওড় (Oxbow Lake) বলে। মূল নদীতে যখন উঁচুমাত্রার বন্যা হয় কেবলমাত্র তখনই বাঁওড়গুলো বিপুল জলরাশি লাভ করে। তবে সাধারণভাবে বর্ষার সময় স্থানীয় বৃষ্টির পানি বাঁওড় এলাকায় এসে জমা

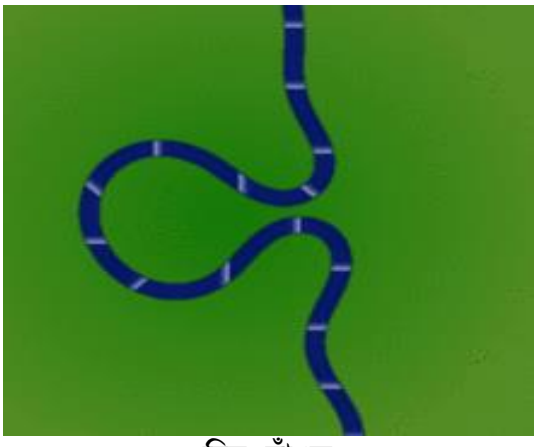

চিত্রঃ বাঁওড়

হয় এবং এই সঞ্চিত জলরাশি কখনও কখনও আশেপাশের প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়ভাবে বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। অসংখ্য জলজ উদ্ভিদ, মৎস্য ও প্রাণীর আবাসস্থল হিসাবে বাঁওড় বাংলাদেশের জলাভূমির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে।

চিত্রঃ বাঁওড়

বিল ঃ

অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির প্রাকৃতিক জলাধার, যেগুলোতে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অভ্যন্তরীণ ও পৃষ্ঠ নিষ্কাশনের মাধ্যমে বহে আসা পানি জমা হয়। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এই অবভূমিগুলো দেখতে পাওয়া যায় এবং এগুলোর অধিকাংশই ভূমিক্ষয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট নিচু ভূসংস্থান ধরনের। জলাভূমির বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ক্ষুদ্র পিরিচের মতো অবনমনকে বিল বলা হয়। অনেক বিলই শীতকালে শুকিয়ে যায়, কিন্তু বর্ষায় প্রশস্ত, তবে অগভীর জলাধারে পরিণত হয়।

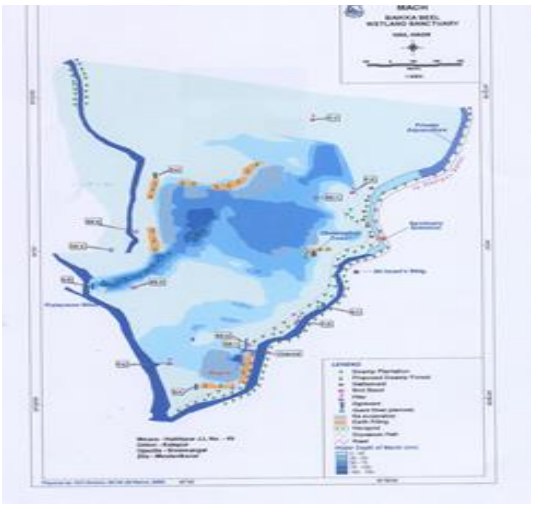

চিত্রঃ বাইক্কা বিল।

জলাভূমি (Wetland) ঃ

বাংলাদেশের ২/৩ ভাগ অঞ্চলকে জলাভূমি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। সারা বছর ৬-৭% অঞ্চলে পানি থাকে এবং মৌসুমে ২১% গভীর বন্যায় প্লাবিত এবং ৩৫% অঞ্চল অগভীর পানিতে নিমজ্জিত থাকে।

প্রধান প্রধান জলাভূমির (Wetland) মধ্যে ঃ

১. নদী ও শাখা নদী
২. অগভির মিঠা পানির হ্রদ ও জলাভূমি (হাওড়, বাওড় ও বিল)
৩. জলাধার (Water Storage Reservoirs)
৪. পুকুর (Fish Pond)
৫. মৌসুমি বন্যায় প্লাবিত কৃষি জমি
৬. মোহনা (Estuarine System with Extensive Mangrove Swamps) সংযুক্ত উপকূল অঞ্চল

বাংলাদেশে সর্বমোট ৭/৮ মিলিয়ন হেক্টর জলাভূমি যার মধ্যে ঃ

- ৪,৮০,০০০ হেক্টর স্থায়ী নদী ও উপনদী

- ৬,১০,০০০ হেক্টর মোহনা ও উপকূল
- ১,২০,০০০-২,৯০,০০০ হেক্টর হাওর, বাঁওড় ও বিল
- ৯০,০০০ হেক্টর জলাধার এবং
- ১,৫০,০০০-১,৮০,০০০ হেক্টর ছোট পুকুর ও মাছ চাষের পুকুর
- ৯০,০০০-১,১৫,০০০ হেক্টর চিংড়ি চাষের পুকুর

বাংলাদেশের জলায়তন ঃ

১. অভ্যন্তরীণ মৎস্যের জলায়তন

(ক) বদ্ধ জলাশয়	ঃ	৫,২৮,৩৯০ হেঃ
• পুকুর ও ডোবা	ঃ	৩,০৫,০২৫ হেঃ
• অক্সবো লেক (বাঁওড়)	ঃ	৫,৪৮৮ হেঃ
• চিংড়ি খামার	ঃ	২,১৭,৮৭৭ হেঃ
(খ) উন্মুক্ত জলাশয়	ঃ	৪০,৪৭,৩১৬ হেঃ
• নদী ও মোহনা	ঃ	১০,৩১,৫৬৩ হেঃ
• বিল	ঃ	১,১৪,১৬১ হেঃ
• কাপ্তাই লেক	ঃ	৬৮,৮০০ হেঃ
• প্লাবনভূমি	ঃ	২৮,৩২,৭৯২ হেঃ

২. সামুদ্রিক মৎস্যের জলায়তন ঃ

• সমুদ্রসীমা (তটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	ঃ	২,৬৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
• একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (তটরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	ঃ	৪১,০৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
• মহীসোপান এলাকা (৪০ ফ্যাদম গভীর পর্যন্ত)	ঃ	২৪,৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
• উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	ঃ	৭১০ কিলোমিটার

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA) ঃ

পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে বা হবার আশংকা রয়েছে তাহা হলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষণা করতে পারবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করে যা প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা বিধিমালা ২০১০ নামে অভিহিত (সংশোধীত)। কিন্তু

১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর ৪০,০০০ হেক্টর জলাভূমি এলাকাকে পৃথকভাবে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষনা দেন।

নিম্নের ছকে বাংলাদেশের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ প্রদত্ত হলো ঃ

ক্রমিক নং	ইসিএ	জেলা	মোট এলাকা (হেক্টর)	ইসিএ ঘোষণার তারিখ
০১	সুন্দরবন	বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা	৭,৬২,০৩৪	৩০/০৮/১৯৯৯ (সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা)
০২	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	কক্সবাজার	১০,৪৬৫	১৯/০৪/১৯৯৯ (৩/৫/১৯৯৯ তারিখে রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা বহির্ভূত করা হয়)
০৩	সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	কক্সবাজার	৫৯০	১৯/০৪/১৯৯৯
০৪	সোনাদিয়া দ্বীপ	কক্সবাজার	৪,৯১৬	১৯/০৪/১৯৯৯ (৩/৫/১৯৯৯ তারিখে রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা বহির্ভূত করা হয়)
০৫	হাকালুকি হাওর	মৌলভীবাজার ও সিলেট	১৮,৩৮৩	১৯/০৪/১৯৯৯
০৬	টাংগুয়ার হাওর	সুনামগঞ্জ	৯,৭২৭	১৯/০৪/১৯৯৯
০৭	মারজাত বাঁওড়	ঝিনাইদহ	২০০	১৯/০৪/১৯৯৯
০৮	গুলশান-বারিধারা লেক	ঢাকা	৫৩.৫৯ বর্গ কি.মি.	২৬/১১/২০০১
০৯	বুড়িগঙ্গা নদী	ঢাকা	নদী ও নদীর উভয় তীরস্থ ফোরশোর (Foreshore) এলাকাসমূহ	০১/০৯/২০০৯
১০	তুরাগ নদী	ঢাকা	নদী ও নদীর উভয় তীরস্থ ফোরশোর এলাকাসমূহ	০১/০৯/২০০৯
১১	বালু নদী	ঢাকা	নদী ও নদীর উভয় তীরস্থ ফোরশোর এলাকাসমূহ	০১/০৯/২০০৯
১২	শীতলক্ষ্যা নদী	ঢাকা	নদী ও নদীর উভয় তীরস্থ ফোরশোর এলাকাসমূহ	০১/০৯/২০০৯

অধিবেশন
৯

শিরোনাম ঃ বন ও জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন -

- প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য বলতে কি বুঝায় এবং এর ব্যাখ্যা;
- বনের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ববলতে কি বুঝায় এবং এর ব্যাখ্যা; এবং
- জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব কি।

সময় ঃ ১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১.	প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য	ঝোড়ো ভাবনা ও আলোচনা	ফ্লিপশীট ও মার্কার	২০ মিনিট
২.	বনের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব	পাঠচক্র, উপস্থাপনা ও প্রদর্শন	তথ্যপত্র ও প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ	২০ মিনিট
৩.	জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব	আলোচনা	তথ্যপত্র, ফ্লিপশীট ও মার্কার	২০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য

- প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়ার জন্য নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে-
  - প্রতিবেশ বলতে কি বোঝায় ?
  - জীববৈচিত্র্য কাকে বলে ?
- আলোচনার সময় তাঁদের বলা প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা ফিপ্লা শীটে/বোর্ডে লিখে আলোচনা করা যেতে পারে।

বনের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

এ পর্যায়ে আলোচনার শুরুতেই এই ম্যানুয়ালে যেসব বনের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে তা অংশগ্রহণকারীদের জানিয়ে দেয়া যেতে পারে।

- এক্ষেত্রে ম্যানুয়ালে ব্যবহৃত বনের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বসমূহ জানা ও উপস্থাপনের জন্য 'পাঠচক্র ও উপস্থাপনা পদ্ধতি' প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পাঠচক্রের জন্য অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫/৬/৭/টি (প্রয়োজন অনুযায়ী) দলে ভাগ করে হ্যান্ডআউট/সংযোজনী থেকে ৬-৭টি বনের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব নির্বাচন করতে বলা যেতে পারে। পাঠের জন্য সময় দিয়ে প্রত্যেক দলকে দলের পাওয়া গুরুত্বসমূহ উপস্থাপন করতে বলা যেতে পারে। পাঠচক্রের জন্য প্রত্যেক দলের মধ্যে প্রয়োজনীয় হ্যান্ডআউট/সংযোজনী (তথ্যপত্র) সরবরাহ করা যেতে পারে।
- এখানে, অংশগ্রহণকারী কর্তৃক বনের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বসমূহ বলার সময় কোন দুর্বলতা দেখা দিলে প্রশিক্ষক/সহায়ক তাঁদের সহায়তা করে বনের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বসমূহের ধারণা পরিষ্কার করে দিতে পারেন।

জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

- জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বসমূহ কি তা প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়ায় আলোচনা করা যেতে পারে।

- সবশেষে আলোচনার সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে।

প্রতিবেশ ঃ

প্রতিবেশ হচ্ছে জীবগুলোর (উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব) একটি দল/গোষ্ঠী যারা তাদের পরিবেশ (যেমন বায়ু, পানি ও খনিজ মাটি) এর জড় উপাদানগুলোর (Nonliving components) সঙ্গে একত্রে পারস্পারিক ক্রিয়াশীল (Interacting) পদ্ধতিতে থাকে।

প্রতিবেশের চারটি আন্তঃক্রিয়াশীল অংশ থাকে-
১। জড় বস্তুসমূহ (Non-living)
২। উৎপাদক (Producer)
৩। খাদক (Consumer)
৪। পচনক্রীয়ায় সক্ষম অনুজীব (ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক) (Microbs)।

জীববৈচিত্র্য ঃ

জীববৈচিত্র্য বলতে বুঝায় জীব (Life) এর বৈসাদৃশ্যের (Variation) মাত্রা (Degree), যা নির্দেশ করে একটি এলাকার জীন বৈসাদৃশ্য, প্রজাতি বৈসাদৃশ্য, অথবা প্রতিবেশ বৈসাদৃশ্যকে।

জীববৈচিত্র্যের আঙ্গিকে জীবের বৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Conservation of Biological Diversity) এর প্রধান লক্ষ্য তিনটি। যথা-
১। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আন্তঃ ও বহিঃ অবস্থানে;
২। জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার যাতে আজকের জীবকূল ভবিষ্যতে কাজে আসে; এবং
৩। জীব সম্পদ থেকে উদ্ভূত উপকারিতা সকলে সমভাবে ব্যবহারে সম্মত হওয়া।

বনের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বঃ

বনের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অনেক কারণ মানব সমাজের কল্যাণে ও জীবন যাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বন প্রতিবেশ। নিম্নে বনের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

কার্বন আধার ঃ

একটি গাছ মানে একটি কার্বন আধার। কার্বন বৃক্ষ দ্বারা সংশ্লেষিত হয়ে বৃক্ষের কাণ্ড, ডালপালা লতা ও মাটিতে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। কার্বন আবদ্ধ অবস্থায় থাকার কারণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন ইত্যাদির মত ক্ষতিকর গ্রীন হাউস গ্যাস বায়ুমন্ডলে হ্রাস পাওয়ার ফলে বিশ্বে উষ্ণায়ন প্রশমিত হয় এবং ওজন স্তর ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা পায়। সরকারীভাবে কিংবা বেসরকারী উদ্যোগে বনকে কার্বন আধার হিসেবে নির্দিষ্ট করে বিভিন্ন উন্নত দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংগঠনের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তির মাধমে কার্বন সংরক্ষিত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১০ সালে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টসহ দেশের ৬টি বনাঞ্চলের কার্বন ইনভেন্টরীর কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। সুন্দরবনে প্রতি

হেক্টরে ২৫৬ মেগা গ্রাম কার্বন পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে সুন্দরবনে মোট ১৬০ মিলিয়ন টন কার্বনের স্টক পাওয়া গেছে যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিরল দৃষ্টান্ত। ইনানী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ৪.৯৬ মিলিয়ন টন, দুধপুকুরিয়ায় ৬.৬৪ মিলিয়ন টন, ফাঁসিয়াখালী সংরক্ষিত বানাঞ্চলে ১.২২ মিলিয়ন টন, সীতাকুন্ড সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ১.০৪ মিলিয়ন টন, মেধাকচ্ছপিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ০.২৬ মিলিয়ন টন এবং টেকনাফ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ৯.৫৯ মিলিয়ন টন কার্বন মওজুদ আছে। উক্ত কার্বন বিক্রয়ের বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংগঠনের নিকট প্রস্তাবনা পেশের কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বনে গড়ে হেক্টর প্রতি ১৪৫ মেঃ টঃ কার্বন মওজুদ আছে (জিএফআরএ, ২০১০)।

অক্সিজেন তৈরী ঃ

বৃক্ষ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মাটির পানি দ্বারা পাতায় সবুজ ক্লোরোফিলের মাধ্যমে জৈব-রাসায়নিক উপায়ে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয। এ অক্সিজেনই উদ্ভিদসহ যে কোন প্রাণীর শ্বাসকার্যে ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, যার অনুপস্থিতিতে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে যে কোন জীবের জীবনপাত ঘটে। এ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত গ্লুকোজই পরবর্তীতে বিভিন্ন জটিল জৈব-রাসায়নি প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার, প্রোটিন, লিগনিন, সেলুলোজ, হেমিসেলুলুজ ইত্যাদি উপাদানে পরিণত হয়, যা দ্বারা আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়।

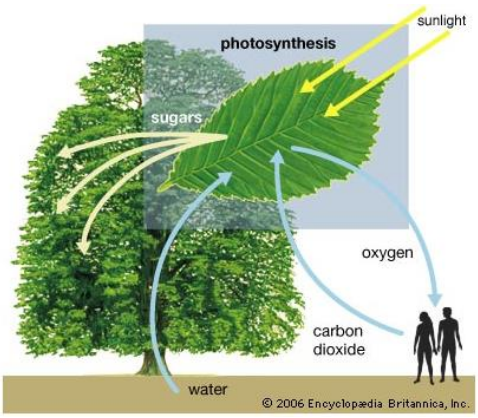

চিত্রঃ সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গাছ কর্তৃক কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন ত্যাগ

পানি প্রবাহ বৃদ্ধি ঃ

বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার বৃষ্টিপাতের অধিকাংশই গাছের পত্র পল্লব, বাকল দ্বারা এবং বনের মেঝে বিয়োজিত (Detached) ও অবিয়োজিত (Attached) জীবাংশ দ্বারা শোষিত হয়। গাছের কারণে বৃষ্টিপাতের গতিবেগ হ্রাস পায়। গাছের শিকড়ের কারণে ভূঅভ্যন্তরে ফাটলের ফলে ভূ-পৃষ্ঠ ছিদ্রময় হওয়ায় এবং হিউমাসের কারণে ভূপৃষ্ঠ স্পঞ্জের মত হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে বৃষ্টির পানির অধিকাংশ ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ পনির স্তরের উচ্চতার বৃদ্ধি ঘটায়। এতে সারা বছর পাহাড়ী ঝর্ণা, ছড়া ও নদ-নদীর পানি প্রবাহ অব্যাহত থাকে এবং নদীর নাব্যতা বজায় থাকে। মৎস্যসহ সকল জলজ প্রাণীর আবাসস্থল হচ্ছে জলাভূমি, খাল, নদী। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌ পরিবহন ব্যবস্থা নির্ভর করে পার্শ্ববর্তী জল বিভাজিকায় (Watershed) বন আছে কিনা, তার উপর গভীর ও অগভীর নলকূপগুলো ভূগর্ভস্থ পানির স্তর (Aquifer) থেকে পানি তোলে। বৃষ্টির পানি নবায়ন (Rainwater recharge) এর মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর (Water table) এর উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মাটির গঠন নির্ভর করে তার উপর উদ্ভিদের প্রজাতি এবং সংখ্যাধিক্যের উপর। অর্থাৎ চিরসবুজ প্রশস্ত পাতা (Broad Leaved Evergreen) বিশিষ্ট প্রজাতির বৃক্ষ মাটির পানি শোষণ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তু জীবন ধারণের মত সুপেয় পানির অভাব ঘটে না। পাহাড়ী এলাকাসহ অন্যান্য জল বিভাজীকা এলাকাসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষাচ্ছাদন থাকলে বৃষ্টির পানি প্রবাহ হ্রাসের কারণে নদ-নদীতে আকস্মিক বন্যার প্রকোপ হ্রাস পায়।

বীজ ছড়ানো ঃ

উষ্ণমন্ডলীয় বনের ক্ষেত্রে বংশ বৃদ্ধির নিমিত্তে বৃক্ষের বীজ ছড়ানোর (Seed disparsal) কাজে বন্য জীব-জন্তুর ভূমিকা রয়েছে। পর্যাপ্ত জীব-জন্তুর অভাবে অনেক বৃক্ষ তাদের বংশ বিস্তারের জন্য তাদের বীজ ছড়াতে পারে না। বন্যপ্রাণী অনেক বৃক্ষের বীজ ছড়ানোর ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটলে অনেক বনাঞ্চলে প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম (Natural Regeneration) ব্যহত হয়। কাজেই এটি গাছের বংশ বিস্তারের জন্যও বন্যপ্রাণী তথা বনাঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে পাখির অবদান সর্বজনবিদিত। এছাড়া সহজ পরাগায়নের অন্যতম উপাদান রয়েছে ভারসাম্যপূর্ণ বন প্রতিবেশে।

চিত্রঃ বীজ ছড়ানো

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ঃ

বৃক্ষ তার বিস্তৃত ডালপালার পত্র পল্লব দিয়ে বাষ্পীয়-প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পরিপার্শ্বস্থ তাপ গ্রহণ করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উত্তপ্ত আবহাওয়া শীতল করে। আবার শীতকালে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমণের মাধ্যমে বন এলাকার তাপমাত্রা অস্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পায় না। এজন্য বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকায় মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী প্রচণ্ড গরম ও তীব্র শীত অনুভব করে না।

বৃষ্টিপাত ঃ

গাছপালা প্রস্বেদন ও বাষ্পীভবন (Evapo-transpiration) প্রক্রিয়ায় ভূগর্ভস্থ পানি জলীয় বাষ্পাকারে বায়ুমন্ডলে ছেড়ে দিয়ে বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য ঘটায় এবং বায়ুমন্ডলের মেঘরাশির ঘনত্ব বৃদ্ধি করে। বায়ুমন্ডলে বায়ু প্রবাহের ফলে জলীয় বাষ্প শীতল হয়ে একসময়ে বৃষ্টিধারায় ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। এ কারণে বৃক্ষহীন এলাকার তুলনায় বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকায় সচরাচর বৃষ্টিপাত বেশী হতে দেখা যায়। বৃষ্টিপাতের তারতম্যের আরো অনেক কারণও রয়েছে। তবে, বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে স্বাভাবিক ভাবে বেশী বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

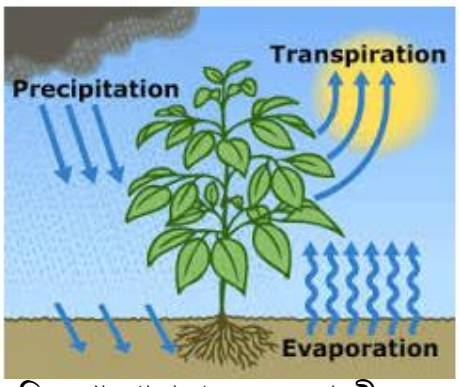

চিত্রঃ গাছপালা প্রস্বেদন ও বাষ্পীভবন এবং বৃষ্টিপাত

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ঃ

গাছ-পালার পত্র পল্লব, ফুল, ফল, মূল মাটিতে পড়ে পঁচে হিউমাস হয়ে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ায়। এতে মাটির অনুজীব ঘটিত ক্রিয়াদি বৃদ্ধি পায় এবং পাখিসহ বন্যপ্রাণীর মলমূত্র ও মৃতদেহ মাটির সাথে মিশে মটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বৃক্ষাচ্ছাদিত এলকায়

চিত্রঃ ফসলের গোড়া থেকে হিউমাস সার

বৃষ্টিপাতজনিত মাটির ক্ষয় কম হয়। এতে নদ-নদীতে পলি জমে নদীর নাব্যতা হ্রাস পায় না এবং নদীতে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও সারা বছর নদীর পানি প্রবাহ অব্যাহত থাকে। গাছ পালার কারণে বরং মাটি গঠনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং হিউমাস মাটিতে রূপান্তরিত হয়ে মাটির গভীরতা বাড়ায়। গাছপালা মাটির গঠন, বুনন, বিক্রিয়া, উর্বরতা, গভীরতা ইত্যাদি ভৌত রাসায়নিক গুণাবলীর অনুকূল পরিবর্তন ঘটিয়ে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়। বিশেষ করে মাটির সরন্ধ্রতা (Porosity), মাটির দৃঢ়সংবদ্ধতা (Soil consistency), ক্যাশন আয়ন বিনিময় ক্ষমতা (Cation Ion exchange capacity), পানি ধারণ ক্ষমতা (Water holding capacity) ইত্যাদি গুনাবলী সবই বনের উপর নির্ভরশীল।

জৈব সার ঃ

চিত্রঃ জৈব সার

আবর্জনা পঁচা জৈব সার উৎপাদন ছাড়াও লিগিউম গোত্রীয় উদ্ভিদসহ অন্যান্য কিছু উদ্ভিদ শিকড় ভূঅভ্যন্তরে কিছু ব্যাকটেরিয়ার সহিত পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করে মাটিতে ছেড়ে দিয়ে অবিরামভাবে নাইট্রোজেন ফর্টিলাইজারের কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট প্রভৃতি জেলার তৃতীয় (Tertiary) যুগের পাহাড় রয়েছে, পাহাড়ের মাঝে মাঝে অসংখ্য পাহাড়ী ছড়া রয়েছে, ঐ ছড়ার পানি প্রবাহ সাংবাৎসরিক (Yearly) থাকলে, পার্শ্ববর্তী কৃষি খামারে (Crop field) উপরিভাগের পানি সেচ (Surface water irigation) এর সুবিধা থাকে। উপরিভাগের পানি সেচ (Surface water irigation) সর্বাপেক্ষা উত্তম, আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ সম্মত। পলল সমভূমির এ বদ্বীপে মাছে ভাতে বাঙ্গালী যা বহুলাংশেই নির্ভর করে ৫৭টি আন্তঃসীমারেখা (Transboundary) সহ ২৩০টি নদীর নাব্যতার উপর। আর এসব নদীর নাব্যতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে হিমালয় পর্বতে বৃক্ষাচ্ছাদন হ্রাস পাওয়ায়। পানির পরিমানই শুধু নয়, পানির গুনাগুনও নির্ভর করে যেখান থেকে বৃষ্টির পানি নদীতে নামে (Catchment) সেস্থানের উদ্ভিদের প্রাচুর্যের উপর। কারণ বন সহজে পানি শুষে নিতে পারে বা Sponge হিসাবে কাজ করে, যাতে পানি পরিশ্রুত (Filtering) এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয়ে থাকে।

আইপিএম (Integrated Pest Management) ঃ

নিমসহ কিছু কিছু ভেষজ বৃক্ষের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংসের ক্ষমতা থাকায় এদের উপস্থিতিতে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের উপদ্রব কমে ফসলী জমিতে কিংবা শস্য ভান্ডারে অর্থ ব্যয়ে ক্ষতিকর রাসায়নিক কীটনাশাক ও ছত্রাকনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। ফলে মাটি সূদুর প্রসারী ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় এবং পানি দূষণ কমে মৎস্য ও জলজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। নানারকম পাখি গাছে আশ্রয় নেয় এবং ফসলী জমির ক্ষতিকর পোকা মাকড় খেয়ে কীটনাশক ব্যবহারের হ্রাস ঘটায় এবং বিষ্ঠা ত্যাগ করে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হ্রাস ঃ

গাছপালা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হ্রাস করে জনপদের ক্ষয়ক্ষতির প্রশমন ঘটায়। জলোচ্ছ্বাসের সময় উপকূলীয় এলাকার বহু লোক গাছে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করতে পারে। সিডর, আইলাসহ সামুদ্রিক সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ থেকে জনপদকে রক্ষা করেছে সুন্দরবন। এই ধারণাকে অবলম্বন করেই উপকূলীয় বন সৃজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ৭১০ কিঃমিঃ উপকূল রেখা (Coastline) বরাবর সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি করা গেলে সাইক্লোনের তীব্রতা আরো হ্রাস পাবে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ঃ

বাংলাদেশ এক সময়ে জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল। দেশে প্রায় ৫৭০০ সপুষ্পক উদ্ভিদ, ২৬৬ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ২২ প্রজাতির উভচর, ১০৯ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩৮৮ প্রজাতির স্থানীয় পাখি ও ১১০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী বিদ্যমান ছিল । কিন্তু বিভিন্ন কারণে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। বনাঞ্চল বৃদ্ধি করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। বৃক্ষ তথা বনাঞ্চল জীববৈচিত্র্যের আধার। বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকায় জীবনের নিরাপত্তা, খাদ্যের যোগান, সহজ প্রজনন, নিরাপদ আশ্রয় এবং অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে বিভিন্ন প্রকারের বিপুল উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠির সমাবেশ ঘটে। উপযুক্ত খাদ্যচক্র ও খাদ্যজাল তৈরীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাস্তুসংস্থান গড়ে উঠে। এতে সমৃদ্ধ হয় প্রকৃতি এবং বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের জীবনধারণ সহজতর হয়। প্রকৃতিতে জীবকুলের অস্তিত্ব হুমকির হাত থেকে রক্ষা পায়। জীববৈচিত্র্য ভেষজ উদ্ভিদের আধার । ভেষজ চিকিৎসার ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন নিরাপদ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে এই বাংলাদেশে।

চিত্রঃ জীববৈচিত্র্যে

ইকোট্যুরিজম (Ecotourism) ঃ

আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে নগর জীবনের ব্যস্ততার ফাঁকে আনন্দ ও প্রশান্তির প্রত্যাশায় মানুষ ছুটে চলে নির্মল প্রকৃতি বন ও বনানীর কাছে। সারা বিশ্বে ইকোট্যুরিজম বা পরিবেশ পর্যটন ১টি জনপ্রিয় শিল্প হয়ে উঠেছে। দিন দিন এ শিল্পে বিনিয়োগ বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিবেশ পর্যটন শিল্প তাদের জিডিপির একটি বড় অংশ দখল করে আছে। কেনিয়া তার জিডিপির শতকরা ১০ ভাগ আয় করে পরিবেশ পর্যটন থেকে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার। কোস্টারিকা প্রায় ৩৩৬ মিলিয়ন ডলার আয় করে থাকে, যা জিডিপির শতকরা ২৫ ভাগ। এক হিসাবে দেখা যায় যে,

চিত্রঃ মারমেইড ইকো-রিসোর্ট, কক্সবাজার

প্রতিবছর পৃথিবীতে ৪০০ মিলিয়ন মানুষ ভ্রমণ করে, যা থেকে সারা বিশ্বে আয় হয় ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। এ আয় সারা পৃথিবীর জিডিপি'র শতকরা প্রায় ৬ ভাগ।

ইকোট্যুরিজম হচ্ছে, প্রকৃতি ভ্রমণ বা পরিবেশ পর্যটন। যেখানে উদ্ভিদ, প্রাণী, স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মূল আকর্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়। ইকোট্যুরিজম এলাকার জনগণের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং স্থানীয় প্রাকৃতকি সম্পদ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের ইকোট্যুরিজমের বিশাল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হলো বিচিত্র বনাঞ্চল, বন্যপ্রাণী ও চির সবুজ বনাঞ্চলে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে ভরপুর গাছ-গাছালি। বন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রক্ষিত এলাকার সংখ্যা ৩৪টি, যার মোট আয়তন ২ লক্ষ ৬৫ হাজার হেক্টর এবং দেশের মোট আয়তনের ১.৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে ১৭টি জাতীয় উদ্যান এবং ১৭টি বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য। এ সমস্ত প্রাকৃতিক এবং রক্ষিত বনাঞ্চলে বিপুল পরিমাণ দেশী-বিদেশী পর্যটক ভ্রমণ করে থাকে। বিগত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ২৪ লক্ষ ১৩ হাজার দেশী-বিদেশী পর্যটক উক্ত এলাকায় ভ্রমণ করেছেন। উক্ত পর্যটকের নিকট হতে রাজস্ব হিসেবে আয় হয়েছে প্রায় ২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। আমাদের দেশে ইকোট্যুরিজম শিল্প বিকাশের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, প্রচার এবং প্রশিক্ষণ। রক্ষিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ইকোট্যুরিজম কর্মকান্ড সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে আরো ব্যাপক স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

চিত্রঃ মাধবকুন্ড, মৌলভিবাজার

আধ্যাত্মিক বিশ্বাস (Religious Belief) ঃ

বনাঞ্চলের সন্নিকটে বসবাসরত জনগোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রে বনের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করে। তারা বনের ভেতর প্রবেশ করে পূজা-পার্বনসহ তাদের ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ করে। গাছকে তাঁরা প্রাকৃতিক শক্তি হিসেবে উপাসনা করে। প্রাচীনযুগের মানুষেরা বৃষ্টিপাত, পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন, সহজেই সন্তান প্রসবের জন্য গাছের নিকট আরাধনা করত। এ ক্ষেত্রে সুন্দরবনের উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। সুন্দরবনের অভ্যন্তরে খুলনা রেঞ্জের আদাচাই টহল ফাঁড়ির বনাঞ্চলে শেখের মন্দির লক্ষ্য করা যায়। একসময় এ মন্দিরে জেলেরা এসে পূজা করত। বানিয়াখালী ষ্টেশনের আওতাধীন বনাঞ্চলে বন বিবির স্থায়ী ও অস্থায়ী পূজার মন্ডপ দেখা যায়। সেখানে মৎস্যজীবিরা স্টেশন থেকে পাস সংগ্রহ করে উক্ত মন্ডপে পূজা করে মাছ ধরার জন্য সুন্দরবনে প্রবেশ করে।

চিত্রঃ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস

ছাঁয়া প্রদান ঃ

প্রখর সূর্য কিরণের সময় ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রান্ত পথিক, শ্রমিক, দিনমজুর, রিক্সাচালক, কৃষক ও অন্যদেরকে বৃক্ষের ছায়া অনাবিল তৃপ্তি ও শান্তি দেয়। এতে তাদের কর্মস্পৃহা ও কর্মদক্ষতা বাড়ে। গ্রামগঞ্জে অশ্বত্থ ও বট গাছের ছায়া ঐতিহাসিক কাল থেকে ছায়া দিয়ে আসছে। আধ্যাতিক গুহা- এসব স্থানে আস্তানা তৈরী করে মানুষকে বিনোদনে সহায়তা করে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের অচিন বৃক্ষ এজন্য সমধিক প্রসিদ্ধ।

চিত্রঃ গাছ ছাঁয়া প্রদান করে

জলাভূমির প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব ঃ

জলাভূমি প্রতিবেশগুলো বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। জলাভূমিগুলো পরিবেশে অনেক ভূমিকা পালন করে, প্রধানতঃ পানি পরিশোধন (Purification), বন্যা নিয়ন্ত্রণ, এবং উপকূল রেখা (Shoreline) দৃঢ়/সুস্থিত (Stability) করতে। আবার জলাভূমি প্রতিবেশগুলো হয় সবচেয়ে বেশি জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ, যা অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল।

প্রাকৃতিক জলাভূমিগুলোর কাজকে (Function) শ্রেণীবিন্যাস করা হয় প্রতিবেশে জলাভূমির উপকারসমূহের ভিত্তিতে। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ প্রতিবেশ মূল্যনির্ধারণ (United Nations Millennium Ecosystem Assessment) এবং রামসার সমঝোতা (Ramsar Convention) অনুযায়ী জলাভূমিগুলোর জীবমন্ডল (Biosphere) ও জনগোষ্ঠিতে গুরুত্ব রয়েছে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেঃ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ

পানি ধারক ও বন্যা প্রতিরোধক। প্লাবনভূমির (Floodplains) জলাভূমি পদ্ধতি (System) গঠিত হয় অধিকাংশ নদীর উৎসভাগ (Headwaters) হতে ভাটিতে (Downstream)। অধিকাংশ নদীর প্লাবনভূমিগুলো প্রাকৃতিক পানি ধারক হিসাবে কাজ করে, অতিরিক্ত পানি বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে দিতে সক্ষম, যা প্লাাবনভূমির গভীরতা ও স্রোতকে হ্রাস করে। ছড়া (Sream) ও নদীর উৎসভাগের কাছাকাছি জলাভূমিগুলো বৃষ্টির পানি ও বসন্তের তুষার গলানো (Snowmelt) পানির প্রবাহকে মন্থর করে (Slow) যাতে সরাসরি ভূমিতে পানি দ্রুত সঞ্চালিত (Courses) না হয়। যা ভাটিতে হঠাৎ বন্যা ও এর ক্ষতি প্রতিরোধে সাহায্য করে।

ভূগর্ভস্থ পানির শূন্যস্থান পূরণ (Replenishment) ঃ

ভূপৃষ্ঠের পানি (Surface water) যা দৃশ্যত (Visibly) দেখা যায় জলাভূমি পদ্ধতিতে এবং ভূপৃষ্ঠের এই পানি প্রতিনিধিত্ব করে সার্বিক (Overall) পানি চক্র (Water cycle) এর একটি অংশ মাত্র যাতে আরো অন্তর্ভূক্ত থাকে বায়ুমণ্ডলীয় পানি (Atmospheric water) ও ভূগর্ভস্থ পানি। জলাভূমি পদ্ধতিগুলো সরাসরি

ভূগর্ভস্থ পানির সাথে সংযুক্ত এবং ভূমির নীচে যে পানি পাওয়া যায় তার পরিমাণ ও গুণাগুণ এই উভয় ক্ষেত্রেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক। জলাভূমি পদ্ধতিগুলো যা ভেদ্য (Permeable) পলি (Sediments) যেমন চুনা পাথর দ্বারা তৈরী অথবা যে স্থানে ঘটে তা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল (Variable) ও অনিয়মিত (Fluctuating) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর (Water table) বিশেষভাবে যেখানে জলাভূমির ভূমিকা থাকে ভূগর্ভস্থ পানির শূন্যস্থান পূরণ বা পুনরায় পানি পূর্ণ করণে (Water recharge)। পলি যা সূক্ষ্মরন্ধ্রযুক্ত (Porous), পানিকে মাটি এবং ভূগর্ভের যে স্তর থেকে খাবার পানি উত্তোলন করা হয় সে স্তর (Aquifers) এর উপরে থাকা পাথর দ্বারা পরিশ্রুত করে (Filter) ভূতলে (Down) যা বিশ্বের পানীয় জলের ৯৫% উৎস। জলাভূমিগুলো আবার পানি পূর্ণ করণের এলাকা হিসাবে কাজ করে যখন পারিপার্শ্বিক (Surrounding) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর কমে যায় এবং একটি অঞ্চল থেকে যখন অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যায়।

উপকূল রেখা স্থিতিশীল (Stabilisation) এবং ঝড়ের সুরক্ষা (Protection) ঃ

জোয়ার-ভাটা (Tidal) ও সমুদ্রতট (Inter-tidal) এর জলাভূমি পদ্ধতিগুলো উপকূলীয় অঞ্চলকে রক্ষা করে এবং দৃঢ় করে। প্রবাল প্রাচীরগুলো (Coral reefs) উপকূলীয় এলাকায় একটি প্রতিরক্ষামূলক বাধা প্রদান করে। প্যারাবন (Mangroves) অভ্যন্তর (Interior) থেকে উপকূলীয় অঞ্চলকে সুস্থিত করে এবং পানির সীমানা সংলগ্নে থাকা উপকূল রেখার সঙ্গে স্থানান্তরিত হয়। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে প্রবাল প্রাচীর ও প্যারাবন-এর প্রধান সংরক্ষণ সুবিধা হচ্ছে এরা ঢেউ ও জলোচ্ছাসের ফলে সৃষ্ট বন্যার পানির গতি ও উচ্চতা হ্রাস করতে সক্ষম ।

পুষ্টি ধারণ (Retension) ঃ

জলাভূমির পলি ও পুষ্টি (Nutrients) উভয় চক্র স্থলজ (Terrestrial) ও জলজ প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। জলাভূমির গাছপালার (Vegetation) প্রাকৃতিক কাজ পার্শ্ববর্তী মাটি এবং পানিতে যে পুষ্টি পাওয়া যায় তা গ্রহণ করা ও মজুদ রাখা। উদ্ভিদের মরে যাওয়া অথবা প্রাণী বা মানুষের দ্বারা না কাটা পর্যন্ত এই পুষ্টি পদ্ধতির (System) মধ্যে অপরিবর্তিত থাকে। জলাভূমির গাছপালার উৎপাদনশীলতাকে জলবায়ু, জলাভূমির ধরন, এবং পুষ্টির প্রাপ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

পলি জমা (Sediment traps) ঃ

পলি সরানোর জন্য দায়ী জলপথের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি বইয়ে দেওয়া (Run-off)। এই পলি বৃহত্তর এবং আরো বৃহদাকার জলপথের দিকে অগ্রসর হয় একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা পানিকে মহাসাগরের দিকে নিয়ে যায়। মাটি, বালি, কাদামাটি (Silt) এবং শিলা (Rock) দ্বারা গঠিত সকল ধরনের পলি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলাভূমি পদ্ধতির মধ্যে বয়ে আসে (Carried)। জলাভূমিতে অবস্থিত নলখাগড়ার স্তর (Reedbeds) অথবা বন পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করার ফলে পলি জমে।

চিত্রঃ নলখাগড়ার বন

পানি পরিশোধন ঃ

অনেক জলাভূমি পদ্ধতিতে প্রাণপরিশ্রুত (Biofilters), জলজউদ্ভিদ (Hudrophytes), এবং প্রাণী থাকে যাদের পুষ্টি আত্মীভূত করার (Up-take) ক্ষমতা ছাড়াও বিষাক্ত পদার্থ যা কীটনাশক, শিল্প বর্জ্য, এবং খনির কার্যক্রম থেকে আসে তা অপসারণ করার ক্ষমতাও আছে। পুষ্টি আত্মীভূত কান্ড, শিকড়, এবং পাতাসহ উদ্ভিদের অধিকাংশ অংশের মাধ্যমে ঘটে। ভাসমান উদ্ভিদগুলো ভারী ধাতু শোষণ এবং পরিশ্রুত করে। কচুরিপানা (Water hyacinth), অগভীর জলাশয়ের সপুষ্পক উদ্ভিদ (Duckweek), এবং জলজ ফার্ন (Water fern) মজুত করে লোহা ও তামা যা সাধারণত পাওয়া যায় বর্জ্য জলে। অনেক দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদের শিকড় গজায় জলাভূমির মটিতে যেমন নলখাগড়া (Cattail) এবং বেণু-বাঁশ (Reed) যারা ভারী ধাতু আত্মীভূত করতে ভূমিকা রাখে। প্রাণী যেমন ঝিনুক (Oyster) প্রতিদিন ২০০ লিটার (৫৩ গ্যালন) এর অধিক পানি পরিশ্রুত করতে পারে।

চিত্রঃ জলজউদ্ভিদ (Hudrophytes)

জীববৈচিত্র্যের জলাধার (Reservoirs) ঃ

জলাভূমি পদ্ধতির সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য আন্তর্জাতিক চুক্তি (Treaty) সমঝোতা (Conventions) এবং বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল (World Wildlife Fund) প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি অগ্রকর (Focal point) হয়ে উঠেছে জলাভূমিগুলোতে উপস্থিত প্রজাতির উচ্চ সংখ্যা, ছোট আন্তর্জাতিক ভৌগলিক এলাকা, বহুবিস্তৃত (Endemic) প্রজাতির সংখ্যা এবং উচ্চ উৎপাদনশীলতার কারণে। জলাভূমিগুলোর মধ্যে বাস করছে হাজার হাজার প্রাণী প্রজাতি, যাদের ২০,০০০ মেরুদন্ডী প্রাণী। স্বাদু পানির নতুন প্রজাতির মাছ প্রতি বছর আবিষ্কার হয় ২০০টি।

চিত্রঃ জলাভূমি

উৎপাদনশীল সমুদ্রতট (Inter-tidal) অঞ্চল ঃ

যদিও কম সংখ্যক প্রজাতি থাকে তবুও সমুদ্রতটের কর্দমাক্ত ভূমির (Mudflats) উৎপাদনশীলতা জলাভূমির উৎপাদনশীলতা থেকে কম নয়। অমেরুদন্ডী প্রাণীর প্রাচুর্য (Abundance) যা কাদার (Mud) ভিতর পাওয়া যায় সেগুলি পরিযায়ী জলচরপাখির (Migratory waterfowl) খাদ্যের উৎস্য।

জীবন চক্রের গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল (Critical life-stage habitat) ঃ

কর্দমাক্ত ভূমি, লবণাক্ত জলাভূমি (Saltmarshes), প্যারাবন (Mangroves), এবং সামুদ্রিক স্বপুষ্পক উদ্ভিদের ভূমি (Seagrass beds) প্রজাতি ঐশ্বর্য (Richness) ও উৎপাদনশীলতায় ভরপুর, যা অনেক বাণিজ্যিক মাছের ভান্ডার (Stocks) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পোনা লালন (Nursery) এলাকা।

জলাভূমি পণ্য (Wetland products) ঃ

জলাভূমি পদ্ধতিগুলো স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন করে উদ্ভিদ এবং অন্যান্য পরিবেশগত পণ্য যা ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য আহরণ করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাছ যাদের সম্পূর্ণ জীবনচক্র জলাভূমি পদ্ধতিতে ঘটে। স্বাদু ও লোনা পানির মাছ এক বিলিয়ন মানুষের জন্য প্রোটিনের প্রধান উৎস এবং অতিরিক্ত দুই কোটি মানুষের খাদ্যভ্যাস এর ১৫% অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, মাছ মৎস্য শিল্প গড়ে তোলে যা উন্নয়নশীল দেশে বসবাসকারীদের আয় ও কর্মসংস্থানের ৮০% যোগান দেয়। জলাভূমি পদ্ধতিগুলোতে পাওয়া যায় আরেকটি প্রধান খাদ্যদ্রব্য চাল, একটি জনপ্রিয় শস্য যা মোট বৈশ্বিক ক্যালোরি গণনার ১/৫ হারে আহার হয় (Consumed)। বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম, যেখানকার প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যে (Landscape) ধান হচ্ছে প্রধান, সেখানে ধানের ব্যবহার ৭০% এ পৌঁছেছে।

প্যারাবন থেকে মধু সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া জ্বালানি, পশুখাদ্য, ঐতিহ্যগত ঔষধ (যেমন প্যারাবন বাকল থেকে), বস্ত্রশিল্পের আঁশ (Fibers for textiles) এবং রং ও অম্ল পদার্থ/কষ (Tannin) ইত্যাদি পাওয়া যায় প্যারাবন থেকে। তাছাড়া লবণ তৈরী হয় সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হয়ে।

অধিবেশন ১০

শিরোনাম ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি (Arrangement)

- নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ
- সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- মৎস্যসম্পদ এবং বনজ সম্পদের কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;এবং
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সময়ঃ ১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১.	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি	দলীয় কাজ	ফ্লিপশীট/পোস্টার ও মার্কার	২০ মিনিট
২.	মৎস্যসম্পদ এবং বনজ সম্পদের কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ	দলীয় কাজ ও আলোচনা	ফ্লিপশীট, পোস্টার ও মার্কার	২০ মিনিট
৩.	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	পঠন ও আলোচনা	তথ্যপত্র, ফ্লিপশীট ও মার্কার	২০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি

- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি বলতে কি বুঝি তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে জানা যেতে পারে
- এক্ষেত্রে ৪/৫টি দলে ভাগ করে উল্লেখিত বিষয়ের উপর পোস্টারে অংশগ্রহণকারীদের মতামত লেখতে বলা যেতে পারে
- দলীয় কাজ শেষে উল্লেখিত বিষয়ের ওপর অংশগ্রহণকারীদের মতামত সম্বলিত পোস্টারগুলো প্রশিক্ষণ কক্ষের চারদিকের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেয়া যেতে পারে
- পোস্টার দেয়ালে টাঙ্গিয়ে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ঘুরে ঘুরে মতামতগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো এবং উল্লেখিত মতামতগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

মৎস্য সম্পদ এবং বনজ সম্পদের কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় একইভাবে মৎস্য সম্পদ এবং বনজ সম্পদের কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ আলোচনা করা যেতে পারে।
- প্রয়োজনে এক্ষেত্রে হ্যান্ডআউট/সংযোজনীর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

- এ পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে সংযোজনীর সহায়তায় আলোচনা করা যেতে পারে।

- সবশেষে আলোচনার সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি (Arrangement) ঃ

বাংলাদেশের মানব জীবন ও জীবিকা প্রকৃতির সঙ্গে জটিলভাবে (Intricately) পরস্পর সংযুক্ত (Intertwined)। ফলে, কেন্দ্রীয়ভাবে উন্নয়নের কোন প্রক্রিয়া এবং দারিদ্র নির্মূল (Eradication) কল্পনা করা হয় এর পরিবেশের জন্য যত্নশীল এবং টেকসই উন্নয়নের কথা চিন্ত না করে। অন্য দিকে, দরিদ্ররা তাদের জীবিকার জন্য প্রচন্ডভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, দরিদ্রদের উদার সম্পৃক্ততা ছাড়া, পরিবেশ ঠিক রাখা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বাংলাদেশ হলো বহুমুখী পরিবেশগত মতৈক্যে (Multilateral Environmental Agreement) স্বাক্ষরকারী একটি দেশ যেখানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট কার্যভার গ্রহণ করতে যা দরিদ্রদের জন্য উপকারী হবে।

কার্যকরভাবে, দারিদ্র্য-পরিবেশ সম্পর্ক (Linkages) দুই পর্যায়ে স্পষ্ট হয় - এক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ টেকসই জীবিকায়নের জন্য এবং অন্যটি হচ্ছে দূষণের বিরোধিতা/নিয়ন্ত্রণ করা জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণ ও মানব স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য। সামষ্টিক অর্থনীতি (Macroeconomics) এবং বিভিন্ন শাখায় (Sectors) সরকারের নীতিগুলো পরিবেশের উপর কি প্রভাব ফেলে অবশ্যই তা দৃষ্টিপাত করতে হবে। অন্যদিকে দেশের দ্রুত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় "সবুজ বনাম বাদামি" মতানৈক্য (Arguments), পরিবেশগত বিষয়সমূহের উপেক্ষা, হতে পারে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশের ক্ষতি এবং এছাড়াও বৃদ্ধি ও বিকাশের হ্রাস। একই সময় বাংলাদেশের জন্য এটি অত্যাবশ্যক কম সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য কমাতে দ্রুততর হওয়া। অতএব একটি সতর্ক ভারসাম্যপূর্ণ আইন অবশ্যই রচনা করতে হবে যেখানে পরিবেশ রক্ষা এবং নিরাপত্তায় আপোস (Compromising) ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে সর্বোচ্চ পরিমাণে। সরকারের নীতি ও কর্মসমূহ অবশ্যই যেন গরীবদের প্রান্তিক (Marginalization) অবস্থার কারণ না হয় এবং উন্মুক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে তাদের প্রবল বা তীব্র করে না তোলে, অথবা তাদের আরো ক্ষতিগ্রস্ত (Vulnerable) না করে দূষণের ঝুঁকিসমূহ (Pollution Hazards)।

অন্য দিকে পাল্টা যুক্তি আছে যে প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি সৃষ্টি করে সরকারী রাজস্ব এবং সম্পদ যা ব্যবহার করা হয় বৃদ্ধির মান বাড়ানো (Enhance) এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি সাধনে। পরিবেশগত বিষয়ের আলোকে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি দেশে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনা দারিদ্র হ্রাসের একটি পূর্বশর্ত।

মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি ঃ

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ খাত (Sector) দেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টি সরবরাহ এবং রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এটা দেশের জিডিপিতে প্রায় ৫% অবদান রাখে, মোট রপ্তানি আয়ের ৪.৭% এবং প্রায় ৬৩% বার্ষিক প্রোটিন এর যোগান দেয় যা মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ১০% মৎস্যসম্পদের উপর নির্ভর করে তাদের জীবিকার জন্য। এটা দেশের ২য় সর্বোচ্চ রপ্তানি উপার্জক তৈরি পোশাকের পরে।

মৎস্যসম্পদ খাতের জন্য সরকারের একটি জাতীয় নীতি আছে এবং সম্প্রতি প্রণয়ন করেছে এই খাতের জাতীয় কৌশল যাতে মৎস্য খাতের নীতির উদ্দেশ্যগুলো অর্জন সম্ভব হয়। মৎস্যসম্পদ খাতের নীতির

উদ্দেশ্যগুলো হলো (১) মৎস্যসম্পদ এবং এর উৎপাদন বৃদ্ধি করা, (২) প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা, (৩) দারিদ্র্য হ্রাস এবং দরিদ্র ও ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, (৪) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন, (৫) প্রতিবেশগত ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন।

জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ এবং জাতীয় মৎস্য কৌশল ২০০৬ এ মৎস্যসম্পদ খাতের সব ক্ষেত্র এবং বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এই নীতি ও কৌশলে সকল মৎস্যজীবীর উৎপাদন পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যেমন (১) অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদ আহরণ (২) স্বাদু পানির জলজ চাষ (৩) উপকূলীয় জলজ চাষ (Aquaculture) (৪) সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ (বাণিজ্যিক আহরণ (Industrial) ও সনাতনী আহরণ (Artisanal)) ও সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং পরিসেবাসমূহ (Services) যেমন (ক) গবেষণা ও উন্নয়ন (খ) সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ (গ) শিক্ষা (ঘ) মৎস্য পরিচালনা (Handling), পরিবহন ও বিপণন (ঙ) প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য নিরাপত্তা (চ) বাণিজ্য - রপ্তানি এবং আমদানি (ছ) মৎস্যসম্পদ ঋণ (Fisheries credit) (জ) ঋণ, কর অবকাশ (Tax holidays) সরকারী উদ্দীপক (Incentive) এবং সমর্থন (Support) উভয়ই, শিল্প/শিল্প স্থাপন এ সাহায্য (ঝ) সহযোগিতা (ঞ) বিধান (Institution) ও আইনি কাঠামো (ট) বীমা (ঠ) পরিবেশ (ড) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি ঃ

অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উপকারিতা উভয়ই ক্ষেত্রে বন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। প্রতিবেশ ভারসাম্যে পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে বন। তবে, এর প্রতিবেশগত গুরুত্ব/তাৎপর্য হয় অধিক অর্থনৈতিক মূল্যের চেয়ে।

৮ জুলাই ১৯৭৯ সালে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সরকার জাতীয় বন নীতি প্রণয়ন করে। নীতি সংশোধনের জন্য, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকার ফরেস্ট্রি সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (এফএসএমপি) প্রণয়ন করে। এফএসএমপি এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ-নির্ভর (People-oriented) বনজ কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা (Stability) ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বনজ সম্পদের অবদানকে সর্বাধিক অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা (Optimizing)।

এফএসএমপি এর অধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ

- মানুষ-নির্ভর কার্যক্রমসমূহ
- উৎপাদন-নির্দেশিত (Production-directed) কার্যক্রমসমূহ
- প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ (Institutional strengthening)

নীতির সংশোধনীর পর, জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪ এর উদ্দেশ্যগুলো হলঃ

- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ খাতের বৃহত্তর অবদানকে নিশ্চিত করার জন্য, বিভিন্ন বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে দেশের মোট এলাকার প্রায় ২০% বনাঞ্চল হবে

- কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, গ্রামীণ ও জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণে, এবং দারিদ্র বিমোচনের সুযোগের জন্য, গাছ ও বন ভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন খাতের সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করা (Consolidate)
- পাখি ও প্রাণীর অবশিষ্ট প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণের দ্বারা বিদ্যমান হ্রাসকৃত বনের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হবে
- কৃষিখাত জোরদার করা হবে এই খাতের সহায়তা সম্প্রসারিত করে বিশেষ করে বন উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত ভূমি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণ দ্বারা
- বিভিন্ন জাতীয় প্রচেষ্টা ও সরকার অনুমোদিত চুক্তি বাস্তবায়ন দ্বারা জাতীয় দায়িত্ব ও অঙ্গিকারগুলো পালন করা হবে যা বৈশ্বিক উষ্ণতা, মরুকরণ ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যপাখি ও প্রাণীর বাণিজ্য সম্পর্কিত
- স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা হবে বনের জায়গায় অবৈধ দখলদারিত্ব, অবৈধ গাছ কাটা ও বন্যপ্রাণী শিকার
- বনজ দ্রব্যের সদ্ব্যবহার (Utilization) ও প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপে কার্যকর ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে
- উৎসাহ ও সহায়তা দেওয়া হবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় জমিতে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে

মৎস্যসম্পদের কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ ঃ

মৎস্যসম্পদ খাতের বিদ্যমান নীতি, কার্যক্রম ও কৌশল এবং মাঠ পর্যায়ের বিষয়সমূহ যেগুলো বর্তমান নীতিতে নেই সেগুলো বিবেচনা করে, কৌশলগত পদ্ধতি এবং নীতির বিষয়সমূহ আলোকপাত করা হয়েছে ছকে।

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	বৃদ্ধি বাড়ানোর কৌশল	পরিবেশগত টেকসইয়ের কৌশল	সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসইয়ের কৌশল	নীতির সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি
অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ আহরণঃ টেকসই উৎপাদন ও দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	• আহরণকৃত মৎস্যসম্পদ (এলাকা, শ্রেণী ও সম্ভাব্য উৎপাদন) এর সমন্বিত পর্যবেক্ষণ উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের প্রবর্তন (Introduction) • মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রজনন মজুদ (Breeding stock)/প্রবেশন (Recruitment) বৃদ্ধি করা • পোনা (চাষকৃত মৎস্যসম্পদের ক্ষেত্রে) মজুদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো যেখানে প্রাকৃতিক প্রবেশন জলাশয়ের সম্ভাব্য উৎপাদনে সাহায্য করে না	• রাজস্ব নির্ভর ইজারা পদ্ধতির পরিবর্তে প্রাকৃতিক (Biological) ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন • জলাশয়গুলো যা মাছের আবাসস্থল, অভিপ্রয়াণ (Migration), প্রবেশন/ প্রজনন, খাদ্য এবং মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক তার পরিবেশ/প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা • সীমান্ত পার হওয়া (Cross boundary) নদীগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগীতার উন্নয়ন • মৎস্যসম্পদ আহরণে সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন (Maximum Sustainalbe Yield-MSY) স্তর নিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ প্রচেষ্টা (Effort)	• স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও স্থানীয় সরকার এর সম্পৃক্ততা • জনগোষ্ঠীর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা ও জেলে সম্প্রদায়কে সরাসরি লাইসেন্স দেওয়ার পদ্ধতি নিশ্চিত করা • জেলে সম্প্রদায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা	• অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদের বিধি-বিধানগুলোর যথাযথ কার্যকরীকরণ নিশ্চিত করা • ভালো সমন্বয় ও উপযুক্ত পরিকল্পনার জন্য সকল মন্ত্রণালয় যেগুলো মৎস্যসম্পদের সাথে সংযুক্ত তাদেরকে নিয়ে একটি জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিষ্ঠা করা • উৎপাদন ও সরবরাহ এবং হ্যাচরিগুলোর নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন (Certification) প্রস্তাবে গুণগত মান (Quality inputs), নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রিত কাঠামো (Framework) স্থাপন করা • সম্পদের অবস্থা (Status), উৎপাদন স্তর ও উন্নয়নের কার্যকারিতা এবং বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতিঃ (১) অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ আহরণ, (২) সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ, এবং (৩) জলজ চাষ এর নীতির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য এই খাতের ব্যবস্থাপনা কার্যকলাপসমূহ পরিবীক্ষণ করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা উপযুক্ত জনশক্তি ও যন্ত্রপাতি
স্বাদু পানির জলজ চাষ ও সম্প্রসারণ সেবাসমূহঃ জলজ	• বিভিন্ন প্রকার জলাশয়, মাটি ও পানির গুণাগুণ এর উপর ভিত্তি করে উন্নত ও টেকসই উৎপাদনের জন্য	• জলজ চাষ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক/ ঔষধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা	প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তায় জলজ চাষের জন্য জনসাধারণের সেবায়	

চাষের টেকসই উৎপাদন, দারিদ্র্য লাঘব, পুষ্টি ও রপ্তানি আয়	যথাযথ চাষ প্রযুক্তি ও পদ্ধতির উন্নয়ন ● অধিক উৎপাদনের জন্য উন্নত, পরিবেশ বান্ধব ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য জলজ চাষ উন্নত করা ● বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গুণগত উপাদানসমূহের (মাছের পোনা/আঙ্গুলি, খাদ্য, সার, ঔষধ ইত্যাদি) উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা	● চাষকৃত প্রজাতির বৈচিত্র্যতা আনয়নে বিদেশী প্রজাতিগুলো যদিও উচ্চ উৎপাদনশীল হয় তবুও সেগুলো প্রবেশ সীমাবদ্ধ রাখা যদি স্থানীয় প্রজাতি ও পরিবেশের উপর ক্ষতি সাধন করে	নিয়োজিত (Public) জলাশয়গুলো যেমন পুকুর, খাল, গর্ত (Burrow pits) ইত্যাদিতে ভূমিহীন/দরিদ্র পুরুষ ও নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা	(Logistics) সহ ● মাছ/চিংড়ি ও বিদেশী ক্রেতার চাহিদা অনুসারে মৎস্যজাত পণ্যসমূহের মান ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি বিধি-বিধানের কাঠামো প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাসহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে ● সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের আইন ও বিধানগুলোর যথাযথ সম্পাদন ● আন্তর্জাতিক মহাসমুদ্র নীতি অনুসারে এবং প্রতিবেশী দেশ - ভারত ও মায়ানমার এর সাথে সংলাপ করে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা উচিত ● খাতটির চাহিদার উপর ভিত্তি করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারী ও সুফলভোগীদের চাহিদাগুলো নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত গবেষণার ফলে জ্ঞান ও সম্পদ সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি করা ● উপযুক্ত গবেষণার চাহিদা নিরূপণ ও মাঠ/কাঙ্খিত দলগুলোর কাছে গবেষণার ফলাফলগুলো প্রচারের জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করা ● গবেষণা ও খাদ্যের প্রয়োজনীয় জ্ঞানকে
উপকূলীয় জলজ চাষ (চিংড়ি খামার ও শিল্প), পরিবেশ বান্ধব ও সমাজ সমর্থন খামার পদ্ধতি দ্বারা উৎপাদিত চিংড়ি রপ্তানির মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নতি	● টেকসই পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক উৎপাদনের জন্য পরিবেশ বান্ধব ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য চিংড়ি চাষ প্রযুক্তির উন্নয়ন ● চাহিদা পূরণের জন্য হ্যাচারি ও ডিমওয়ালা চিংড়ির উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত ভাল মান ও রোগমুক্ত চিংড়ি পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা ● প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো থেকে চিংড়ি খামার পদ্ধতিকে রক্ষা করা	● চিংড়ি খামারের জন্য উপযুক্ত কৃষি-প্রতিবেশগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে চিংড়ি খামার এলাকার উন্নয়ন ● দরিদ্র পোনা আহরণকারীদের জীবিকায়নের জন্য প্রাকৃতিক জলের ভারসাম্য প্রয়োজন, সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক পোনা সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা	● স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে জীবিকায়নে সহযোগিতার জন্য চিংড়ি খামারে লাভ নিশ্চিত করা ● চিংড়ি খাতের টেকসইকরণে বিশেষ করে স্বল্প উৎপাদকারীদের জন্য মূল্যবান জলজ চাষ উৎপন্নদ্রব্যগুলো অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে স্থানীয় বাজার উন্নয়নে	
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদঃ	● অতিরিক্ত আহরণ পরিহারের জন্য নিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ প্রচেষ্টার	● দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে	● উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলজ সম্পদ	

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও রক্ষার মাধ্যমে টেকসই উৎপাদন ও দরিদ্রদের উন্নত জীবিকায়ন	মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল স্তরে বিচক্ষণ (Judicial) আহরণের জন্য সম্পদের ধরন অনুসারে যেমন তলদেশ (Demarsal), উপরের স্তর (Pelagic), এবং সামুদ্রিক আগাছা (Sea weeds) সহ বিভিন্ন গভীর স্তর/এলাকার (উপকূলবর্তী (Inshore), সমুদ্রবর্তী (Offshore) ও গভীর সমুদ্র) অন্যান্য জলজ সম্পদ এবং মাছ ধরা জালের ধরনের উপর মৎস্য আহরণ এলাকা ভাগ করার মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ/মজুদ এর পরিমাণ নির্ধারণ করা ● মৎস্যজীবীদের জীবন ও সম্পদের জন্য বিমা পদ্ধতি প্রবর্তন ● সম্পদের বিচক্ষণ আহরণ নিশ্চিত করার জন্য ও মজুদের অবস্থা হালনাগাদ করার জন্য বাণিজ্যিক আহরণ পরিবীক্ষণ ও পরীক্ষামূলক মৎস্য আহরণের মাধ্যমে সম্পদের অনবরত পরিবীক্ষণ	সামুদ্রিক ও মহীসোপান (Estuarine) মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতিসাধনে সহায়তা করা ● মজুদের সহনশীল অবস্থার (Level) মধ্যে প্রবেশাধিকার অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে এবং সনাতনী আহরণ স্তরে মৎস্য আহরণ প্রচেষ্টা সঠিকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে	ব্যবস্থাপনায় উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ ● নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো সরবরাহের দ্বারা মৎস্য আহরণ অধিকার ও এর ব্যবস্থাপনা জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী দলের জন্য বন্টন করা ● টাকা ঋণদাতা/ মহাজনের দ্বারা শোষণ (Exploitation) পরিহার (Avoid) করার জন্য দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য সহজ শর্তে ঋণের সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করা	উৎসাহিত করার জন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে দৃঢ় সংযোগ নিশ্চিত করা ● মৎস্য অধিদপ্তর, এর অংশীদার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে এর প্রাথমিক সুবিধাভোগীগণ এর সম্ভাবনাগুলো (Potentials) উৎপাদনশীল ব্যবহারে সক্ষম করে (Enable) প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের জন্য তাঁদের জ্ঞান ও ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনে সারা (Respond) দেওয়া ● বর্তমান অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে মৎস্যসম্পদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বাস্তবভিত্তিক হতে হবে ● প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তর/বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনিস্টিটিউট এর কর্মচারীবৃন্দের পেশাগত দক্ষতা/ক্ষমতার উন্নয়ন

বনজ সম্পদের কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ ঃ

বনজ সম্পদ খাতের কৌশল ও নীতির বিষয়সমূহ ছকে বর্ণনা করা হল।

খাত	প্রাকৃতিক সম্পদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার কৌশল	পরিবেশগত টেকসইয়ের কৌশল	সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসইয়ের কৌশল	নীতির সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি
বনজ সম্পদ	• বনের আচ্ছাদন বিস্তার (জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪ অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে ভূমির ২০% এলাকা বনের আওতায় আনা) • বন অপসারণ (Extraction) ও পরিবহন প্রযুক্তির উন্নয়ন • বনের প্রতিবেশ ব্যবস্থার অগ্রগতিসাধন এবং বনের জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বৃদ্ধি করা • শহর ও পল্লী উভয় এলাকায় বসতভিটা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বন বৃদ্ধি করা • বন ভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিকের অনুপাত বেশি এমন (Labour-intensive) শিল্প উন্নত করা (Develop) • বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কাজের মাধ্যমে বনের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি	• শহর ও পল্লী উভয় এলাকায় প্রতিবেশ ও এলাকা-ভিত্তিক বনায়ন কার্যক্রম • প্রতিবেশ বিবেচনায় বন ভূমিকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা (Zoning) • বন এলাকা ও প্রাকৃতিক আবাসস্থলের ধারণ ক্ষমতা বিবেচনা করে পরিবেশবান্ধব পর্যটনে সাহায্য করা • রক্ষিত এলাকার প্রসার (Expanding), অপ্রবেশ্য (Inaccessible) ভূমি (ঢাল (Slopes), ভঙ্গুর (Fragile) জল বিভাজিকা, জলাভূমি (Swamp) ইত্যাদি) সংরক্ষণ, আরো অভয়াশ্রম চিহ্নিত ও উন্নত করা, বিপদাপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতির পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা প্রস্তুত করার মাধ্যমে বনের জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বাড়ানো • অপ্রধান বনজ দ্রব্যের টেকসই ব্যবস্থাপনা • উৎপাদনশীল ও মানসম্পন্ন চারার উপাদানসমূহ বিতরনের পদ্ধতি উন্নত করা	• সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ ও মালিকানা (উপজাতি, স্থানীয়, নৃতাত্ত্বিক (Ethnic) দল এবং দরিদ্ররাসহ) নিশ্চিত করা • স্থানীয় জনগোষ্ঠী দ্বারা কাঠ, ফলজ ও ঔষধি গাছ রোপণের জন্য জনগোষ্ঠী ভিত্তিক ব্যাপক সচেতনতা কর্মসূচী সাধনে সহায়তা করা • কৃষি-বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন রীতির অগ্রগতিসাধনে সহায়তা করা	• বেসরকারি বনজ প্রতিষ্ঠান ও গাছ লাগানোর জন্য ভূমির ব্যবহারে উৎসাহিত ও সাহায্য করা • বন বিভাগসহ সমাজে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর ক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি • বনজ খাতের কার্মকণ্ডে সহায়তায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনিস্টিটিউটের ক্ষমতা শক্তিশালী করা • দেশের বনজ দ্রব্য পরিবহন সংক্রান্ত বিধি ও কার্যপ্রণালীগুলো হালনাগাদ করা • বনজ সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের জন্য পদ্ধতির উন্নয়ন • শহর এলাকায় “গাছ ছাড়া রাস্তা হবেনা” নীতি গ্রহণ করতে হবে • বনজ সম্পদ ও সবুজ আচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা শক্তিশালী করা • বন আইন কঠোরভাবে কার্যকরীকরণ এবং যদি প্রয়োজন হয়ে নতুন আইন সরকারিভাবে ঘোষণা করা

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/মন্ত্রণালয় মৎস্য সম্পদ খাতের সাথে জড়িত। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর অধীন মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনিস্টিটিউট হচ্ছে প্রধান সংস্থা যারা এই খাতের নীতির উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে এবং এর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নীতিগতভাবে দায়ী (Responsilbe), যখন অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ যেমন ভূমি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিকল্পনা/অর্থ ও প্রশাসনিক এবং আইন প্রয়োগকারী বিভাগ সরাসরি ও পরোক্ষভাবে মৎস্যসম্পদ খাতের সাথে সংযুক্ত। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় আরো রয়েছে মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটউট, মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৎস্যবীজ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ইত্যাদি।

জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সহজতর করা বন বিভাগের মূল দায়িত্ব। দেশের অর্থনৈতিক ও প্রতিবেশের উন্নয়নে বনজ সম্পদ রক্ষা ও ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য ও জলবিভাজিকা (Watersheds) সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে, বন বিভাগের রয়েছে বহুমাত্রিক কাজ। বন বিভাগ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনিস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন। তাছাড়া বন বিভাগের আওতায় রয়েছে বন উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফরেস্ট একাডেমি, ফরেস্ট্রি সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ইনিস্টিটিউট, সামাজিক বনায়ন নার্সারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সামাজিক বনায়ন প্লানটেশন কেন্দ্র ইত্যাদি।

অধিবেশন
১১

শিরোনাম ঃ কোর্স মূল্যায়ন, পর্যালোচনা এবং সমাপ্তি

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে -

- সম্পূর্ণ কোর্সটি পুনরালোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা ভাল করে পুনরায় জানবার সুযোগ পাবেন;
- প্রশিক্ষণের শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু থেকে অংশগ্রহণকারীরা দক্ষতা অর্জন ও ভবিষ্যতে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে কিভাবে কাজে লাগাবেন তা চিহ্নিত করতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণের শুরুতে প্রশিক্ষণার্থীরা যে সকল প্রত্যাশা করেছিলেন তা বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করতে পারবেন; এবং
- প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যকারীতা ও প্রশিক্ষণ সহায়কের দক্ষতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

অধিবেশন পরিকল্পনা

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১.	উন্মুক্ত আলোচনা এবং প্রত্যাশা যাচাই	প্রশ্ন ও উত্তর	প্রশিক্ষণের শুরুতেই ফ্লিপশীট/পোস্টারে লিখিত প্রত্যাশাসমূহ	৩০ মিনিট
২.	প্রশিক্ষণ পরবর্তী ধারণা যাচাই/মূল্যায়ন	প্রতিফলনমূলক/লিখিত	মূল্যায়ন ফরম	১৫ মিনিট
৩.	প্রশিক্ষণ সমাপনী পর্ব	বক্তৃতা/আলোচনা	---	৩০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

উন্মুক্ত আলোচনা এবং প্রত্যাশা যাচাই

- প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে, প্রশিক্ষণার্থীরা সকল অধিবেশনগুলি ও প্রত্যাশাগুলি (যা প্রশিক্ষণের শুরুতেই চিহ্নিত করা হয়েছিল) পুনরালোচনার করবেন ;
- সাহায়ক, প্রশিক্ষণার্থীরা যে প্রত্যাশাগুলি করেছিলেন প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে (ফ্লিপ চার্টে প্রদর্শিত) সেগুলি একটি একটি করে বলবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন প্রত্যাশাগুলি পূরণ হয়েছে কিনা।

প্রশিক্ষণ পরবর্তী ধারণা যাচাই/মূল্যায়ন

- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে বলা যেতে পারে যে, এই প্রশিক্ষণ থেকে আমরা যা জেনেছি বা ধারণা অর্জন করেছি তা একটি লিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের যাচাই করবো ;
- এক্ষেত্রে প্রত্যেকে একটি নির্ধারিত ফরমে সম্পূর্ণ কোর্সটির উদ্দেশ্যসমূহ, উপাদানসমূহ, প্রশিক্ষণের উপকরণসমূহ, সহায়ক, সহায়কের সহায়তার প্রক্রিয়া, এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার উপর মূল্যায়ন করবেন। ফরমে আরো খালি জায়গা আছে যেখানে সাধারণ মন্তব্য ও সুপারিশসমূহ লিখতে পারবেন ;
- এপর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের একটি করে কোর্স মূল্যায়ন ফরম সরবরাহ করা হবে যা তাদেরকে পুরণ করতে অনুরোধ করা হবে এবং সহায়ক সেগুলি সংগ্রহ করবেন পুনরায় বিশ্লেষণ করার জন্য;
- এক্ষেত্রে সংযোজনী-১১ এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে ; এবং
- সহায়ক কোর্স মূল্যায়ন ফরমগুলি থেকে প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন সম্পর্কিত কিছু বিষয় আলোকপাত করবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন সমাপ্তি ঘোষণা করবেন এবং সমাপনী সেশনে যোগদানের জন্য সকল অংশগ্রহণকারীদের আহবান করবেন।

প্রশিক্ষণ সমাপনী পর্ব ঃ

- সহায়ক বন বিভাগ/মৎস্য অধিদপ্তর/পরিবেশ অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিস/জেলা কর্মকর্তা পর্যায়ের প্রতিনিধি, অঞ্চল প্রতিনিধি অথবা অন্য প্রতিনিধি যাঁরা প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবেন;
- প্রথমতঃ সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ২/৩ জনকে প্রশিক্ষণে তাদের শিক্ষণীয় বিষয় ও অনুভূতি সম্পর্কে, এবং গঠন মূলক সুপারিশসমূহ ও সহায়ক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলার জন্য আহবান করবেন;
- তারপর সহায়ক আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিদের একজন একজন করে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে সমাপনী বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ করবেন যাতে তাঁরা কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ভালভাবে বাস্তবায়নের করতে পারেন;
- এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানাবেন ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, গঠনমূলক সহায়তা, এবং সহায়কদের সর্বদা সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ইউ এস এইড বাংলাদেশ
প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন

নামঃ (প্রশিক্ষণার্থী/দল) ----------

নিয়োগদাতার নাম/প্রতিষ্ঠান ----------

প্রতিষ্ঠানের ধরন ----------

☐ সরকারী ☐ বেসরকারী ☐ এনজিও ☐ অন্যান্য

বর্তমান পদবী ----------

প্রশিক্ষণ গ্রহণের স্থান

☐ দেশে ☐ তৃতীয় বিশ্বে ☐ ইউ. এস.

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে এই সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্য পেয়েছিলেন কিনা?

☐ হাঁ ☐ না

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা?

☐ হাঁ ভালভাবে ☐ মাঝামাঝি ☐ মোটামুটি ☐ মোটেও না

কর্মক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

☐ খুব ভালভাবে ☐ ভালভাবে ☐ মোটামুটি ☐ মোটেও না

এই প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোন সাফল্যে ঘটনা আছে কিনা? বর্ণনা করুন।

এই প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয় কী? বর্ণনা করুন।

অন্যান্য মন্তব্যঃ ----------

পরিশিষ্ট - ১

প্রশিক্ষক সহায়ক উপকরণ

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সদস্যদের প্রশিক্ষণ কোর্স
অংশগ্রহণকারীদের নাম নিবন্ধনকরণ ছক

প্রশিক্ষণ স্থানঃ **রিজিওন ঃ** **তারিখঃ**

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবি	সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট - ২

আমি প্রকৃতির প্রকৃতি আমার

জীববৈচিত্র্য অভয়ারন্য বন্য প্রাণীর যোগ্য আবাস
বৃক্ষ নিধনে ঘটে পার্থিব জীবনের বহু সর্বনাশ।

বন্যা, খড়া, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিক্ষয় রোধে
সামাজিক বনায়ন চাই মানব সভ্যতার সংকট নিরসন রোধে
বন-বনানী, নিসর্গ নান্দনিক শুদ্ধ পরিবেশ
সু'স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু দূর করে জীবনের ক্লেশ।

যত্নে লালিত বৃক্ষ অর্থের আঁকড়
ফলজ, বনজ, ভেষজ, স্বদেশ স্ব-নির্ভর
মহৎ জীবনে পূণ্য কর্ম বৃক্ষ রোপন
বিশ্বহিতে আমৃত্য বৃক্ষপ্রেমী মন।

দেখি প্রকৃতি রাখি শুধু মনে
রাখিনা চিহ্ন আর কোন খানে
আমি প্রকৃতির প্রকৃতি আমার
এই সত্যবাদ রাখি যেন মনে।

মোরা সিএমসি, প্রকৃতির কথা বলি
মোরা সিএমসি প্রকৃতি পুনুরুদ্ধারের পথে চলি
প্রকৃতির ক্ষতি দেখলে মোরা বারুদের মত জ্বলি

মোরা বন বিভাগের পাশে
থাকবো স্বজনের বেশে
স্বার্থকে করে জলাঞ্জলি।

- ডাঃ মীর আহমদ হেলালী
সভাপতি
মেধাকচ্ছপিয়া সিএমসি

সমাপ্ত